মানবদেহের প্রতিরক্ষা (ইমিউনিটি)
PROTECTION OF HUMAN BODY (IMMUNITY)

১০ অধ্যায়

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বা মানিয়ে চলতে হয়। পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের আণুবীক্ষণিক জীব এবং তাদের দেহজাত পদার্থ (যেমন– ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, তাদের প্রতিবিষ এবং নানা প্রকার বিজাতীয় প্রোটিন) মানুষের দেহে অনেকভাবে প্রবেশ করে এবং মানুষের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াকে কখনো কখনো বিপর্যস্ত করে তোলে বা তোলার চেষ্টা করে। এসব বিজাতীয় বস্তুর বিরুদ্ধে মানবদেহ যে বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে তাই অনাক্রম্যতা (Immunity)। অনাক্রম্যতা বা Immunity ল্যাটিন শব্দ *immunis* থেকে উদ্ভূত। *immunis* অর্থ exempt, যার অর্থ দায়মুক্ত বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত। বিজ্ঞানের যে বিভাগে অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি এবং অনাক্রম্যতা বিষয়ে জানা যায় তাকে অনাক্রম্যবিদ্যা বা ইমিউনোলজি (Immunology) বলে। ড. এডওয়ার্ড জেনার (Dr. Edward Jenner) নামক ইংরেজ বিজ্ঞানী ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে গুটি বসন্তের (Small Pox) ভ্যাকসিন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রথম Immunology সম্পর্কে ধারণা দেন। এজন্য তাঁকে Father of Immunology বলা হয়। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী লুইস পাস্তুর (Louis Pasteur) প্রথম প্রমাণ করেন যে, ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে এমন কিছু আছে যা আক্রান্ত দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এজন্য তাকে Founder of microbiology বলা হয়। দেহের আগ্রাসী কোষ (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল ইত্যাদি) এবং লসিকা গ্রন্থি, প্লিহা প্রভৃতি নিহিত কলাকোষ দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে কাজ করে এবং পরিবেশীয় অদৃশ্য জগতের আক্রমণের বিরুদ্ধে দেহকে সুরক্ষা করে। এ অধ্যায়ে মানবদেহের অনাক্রম্য বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে।

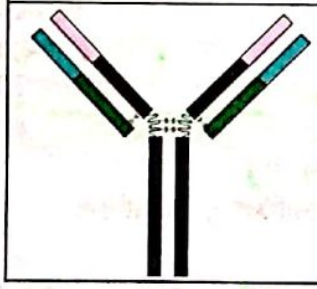
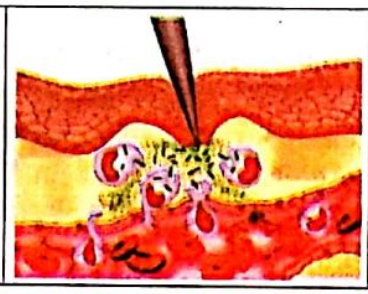

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখবে –

শিখনফল	বিষয়বস্তু (পিরিয়ড সংখ্যা ৯)
১. মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে ত্বকের কাজ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার ক্ষেত্রে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ (Macrophases) ও নিউট্রোফিলসের (Neutrophils) এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. মানবদেহের সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. মানবদেহের প্রতিরক্ষায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • মানবদেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে টিকার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। • দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরক্ষা তৈরিতে মেমোরি কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	• মানবদেহের রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা • প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর ○ প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা ○ খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাক নালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা • দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ○ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলস • তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ○ সহজাত (Inborn) ○ অর্জিত (Acquired) • প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা • প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার ভূমিকা • দেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতি কোষের (Memory) ভূমিকা

CamScanner

১০.১ মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা
(Concept of Defence mechanism of Human body)

একটি প্রাণিসত্তার জীবদেহ পরিবেষ্টিত থাকে এমন একটা পরিবেশ দ্বারা, যা বিপুল সংখ্যক রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু বহন করে। জীবদেহের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এসব জীবাণুর বিভিন্ন পর্যায়ের আক্রমণের মাধ্যমে জীবদেহে প্রবেশকে প্রতিহত করে। সামগ্রিকভাবে সব রকম ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় প্রতিরক্ষা (defence)। ব্যাকটেরিয়া, পরজীবী ও অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলোকে সাধারণভাবে বলা হয় **অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি** (immunity)। আর **বিভিন্ন কোষ ও তাদের সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহকে রোগাক্রমণের হাত থেকে এবং রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করে তাকে অনাক্রম্য তন্ত্র** বা ইমিউনতন্ত্র (immune system) বা **মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা** (human defence system) **বলা হয়**।

অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটির প্রধান উদ্দেশ্য (Major objectives of Immunity)

১। অণুজীবদের (micro-organisms) বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
২। দেহের ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলোকে প্রতিস্থাপিত করা, দেহের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করা এবং
৩। পরিত্যক্ত কোষগুলোকে শনাক্ত করা এবং তাদের ধ্বংস করা।

অনাক্রম্য তন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন কোষ (Different Cells of Immune System)

১। **লিম্ফোসাইট** (Lymphocyte) : T-লিম্ফোসাইট (T-lymphocyte) ও B-লিম্ফোসাইট (B-lymphocyte)।

২। **কিলার কোষ** (Killer cell) : বিশেষ ধরনের **লিম্ফোসাইট যা কিলার সেল বা ন্যাচারাল কিলার সেল** (Natural killer cells or NK Cells) বা নাল কোষ (Null Cell) নামে পরিচিত।

৩। **মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইট** (Mononuclear phagocytes) : এরা দু'রকমের, যথা– **মনোসাইট** (monocyte) এবং **ম্যাক্রোফেজ** (macrophage)। মনোসাইট রক্তে অবস্থিত এক প্রকার শ্বেতকণিকা। এরা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে দেহে প্রবিষ্ট রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে। ম্যাক্রোফেজ (macrophage) কোষ বিভিন্ন রকমের হয়, যথা– **যকৃতের কুফার কোষ** (kuffer's cell), অস্থিমজ্জা, প্লিহা ও লসিকা গ্রন্থির জালক কোষ (Raticulum cells), যোজক কলার **হিস্টিওসাইট** (histiocytes), **অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ** (alveolar macrophage), অস্থির **অস্টিওক্লাস্ট** (osteoclast), বৃক্কের **মেসানজিয়াল কোষ** (mesangial cell), মস্তিষ্কের **মাইক্রোগ্লিয়াল কোষ** (microglial cell) ইত্যাদি।

৪। **গ্রানুলার লিউকোসাইট** (Granular lucocyte) : রক্তে অবস্থিত **নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল ও বেসোফিল**।

৫। **মাস্ট কোষ** (Mast cells) : অ্যারিওলার যোজক কলায় থাকে।

৬। **ডেনড্রাইটিক কোষ** (Dendritic cells) : যেমন– **ল্যাঙ্গারহ্যানস কোষ** (Langerhans cells): ত্বকে ও মিউকাস পর্দায় বা শ্লেষ্মাঝিল্লিতে থাকে; **ইন্টারডিজিটেটিং ডেনড্রাইটিক কোষ** (Interdigitating dendritic cell): থাইমাস গ্রন্থিতে থাকে এবং **ইন্টারস্টিশিয়াল ডেনড্রাইটিক কোষ** (Interstitial dendritic cells): ফুসফুস, যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি অঙ্গে থাকে।

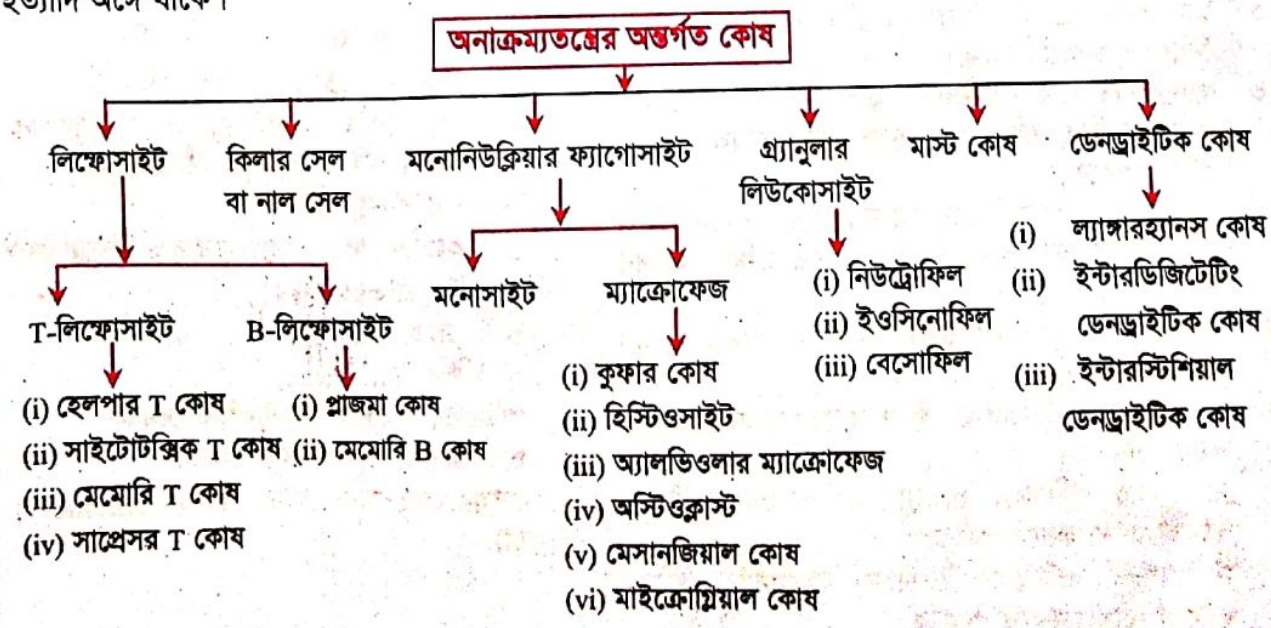

অনাক্রম্যতন্ত্রের অন্তর্গত অঙ্গ (Organs of Immune System)

মানবদেহের অনাক্রম্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব অঙ্গ তাদের লিম্ফয়েড অঙ্গ বলা হয়। মানবদেহের প্রায় সর্বত্র এ অঙ্গসমূহ বিদ্যমান। অনাক্রম্যতন্ত্রের অন্তর্গত অঙ্গ দু'রকমের, যথা–

(ক) **প্রাথমিক লিম্ফয়েড অঙ্গ** (Primary lymphoid organs) : দেহ অনাক্রম্যতন্ত্রের অন্তর্গত যেসব অঙ্গে অনাক্রম্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত রক্তকণিকার (প্রধানত লিম্ফোসাইট) উৎপত্তি ও পরিণতি ঘটে, তাদের **প্রাথমিক লিম্ফয়েড অঙ্গ** বলে। এদেরকে **কেন্দ্রীয়** বা **জেনারেটিভ** (central or generative) লিম্ফয়েড অঙ্গও বলা হয়। যেমন- থাইমাস গ্রন্থি, অস্থিমজ্জা, লসিকা ও লসিকাবাহ ইত্যাদি।

(খ) **গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গ** (Secondary lymphoid organs) : দেহ অনাক্রম্যতন্ত্রের অন্তর্গত যেসব অঙ্গে প্রধানত সঞ্চিত থেকে অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে দ্রুত সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, সেই সব অঙ্গকে **গৌণ লিম্ফয়েড অঙ্গ** বলে। এদেরকে **প্রান্তীয় লিম্ফয়েড অঙ্গ** (peripheral lymphoid organs)-ও বলা হয়। যেমন– প্লিহা, লসিকা গ্রন্থি, অ্যাডিনয়েড গ্রন্থি, টনসিল, অ্যাপেনডিক্স ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রকার লিম্ফয়েড অঙ্গের অবস্থান নিম্নরূপ :

১। **থাইমাস গ্রন্থি** (Thymus gland) : এটি শৈশবকালের গ্রন্থি। হৃৎপিণ্ডের উপরে শ্বাসনালির পেছনে থাইরয়েড গ্রন্থির নিচে অবস্থিত গ্রন্থি। অস্থিমজ্জায় উৎপন্ন Pre T-cell এই গ্রন্থিতে আসে। এই গ্রন্থি নিঃসৃত **থাইমোসিন** (thymosin) হরমোনের প্রভাবে T-lymphocyte-এ পরিণত হয়। ফলে **অনাক্রম্যযোগ্য** (immunocompetent) হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থিতে উপস্থিত ম্যাক্রোফেজ, প্লাজমা কোষ, মাস্ট কোষ দেহে অনাক্রম্যতা গঠনে সাহায্য করে।

২। **অস্থিমজ্জা** (Bone marrow) : অস্থি গহ্বরে এবং স্পঞ্জি অস্থিতে অবস্থিত লোহিত শ্বেত বর্ণের নরম ও চর্বিযুক্ত কলা। এখান থেকে সবরকম রক্ত কোষ সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে শ্বেত রক্তকণিকা অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে।

চিত্র ১০.১ (ক) : মানবদেহের বিভিন্ন লিম্ফয়েড অঙ্গ

৩। **লসিকা** (Lymph) : লসিকানালি বা লসিকাবাহের মধ্য দিয়ে ঈষৎ ক্ষারধর্মী যে তরল যোজক কলা প্রবাহিত হয় তাকে লসিকা বলে। লসিকা বর্ণহীন ও রক্তের ন্যায় এক ধরনের যোজক কলাবিশেষ।

৪। **লসিকানালি** (Lymphatic vessels) : দেহের সর্বত্র বিস্তৃত নালিকা যেগুলো লসিকা পরিবহন করে।

৫। **লসিকা গ্রন্থি** (Lymph nodes) : লসিকা বহনকারী লসিকানালির স্বল্প ব্যবধানে বহু গোলাকার বা ডিম্বাকার স্ফীত অংশ থাকে, এদের লসিকা গ্রন্থি বা লসিকা পর্ব বলে। দেহের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত, তবে ঘাড়ে, বগলে, কুঁচকিতে লসিকা গ্রন্থির পরিমাণ বেশি। লসিকা গ্রন্থিতে অবস্থিত T-lymphocyte এবং B-lymphocyte কোষে অ্যান্টিবডি তৈরি করে দেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে।

৬। **প্লিহা** (Spleen) : উদর গহ্বরে পাকস্থলীর পাশে অবস্থিত লালচে বর্ণের মুষ্ঠি আকারের গঠন। এটি দেহের সবচেয়ে বড় লসিকা গ্রন্থি। প্রাপ্ত বয়স্কদের প্লিহার ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম। প্লিহা প্লাজমা কোষ গঠন করে, যারা রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে। এছাড়া প্লিহার Reticuloendothelial (RE) কোষ ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য বহিরাগত অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করে।

৭। **অ্যাডিনয়েড গ্রন্থি** (Adenoids gland) : নাসিকা নালির পেছনে অবস্থিত দুটি বিশেষ গ্রন্থি।

৮। **টনসিল** (Tonsils) : গলার পেছনের দিকে অবস্থিত দুটি ডিম্বাকার গঠন। এর প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন রোগজীবাণুদের (অ্যান্টিজেন) ধ্বংস করা। টনসিলে রোগজীবাণু প্রবেশ করলে এটি ফুলে ওঠে এবং ব্যথা হয়। কয়েকদিন পর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় তা ফিরে আসে।

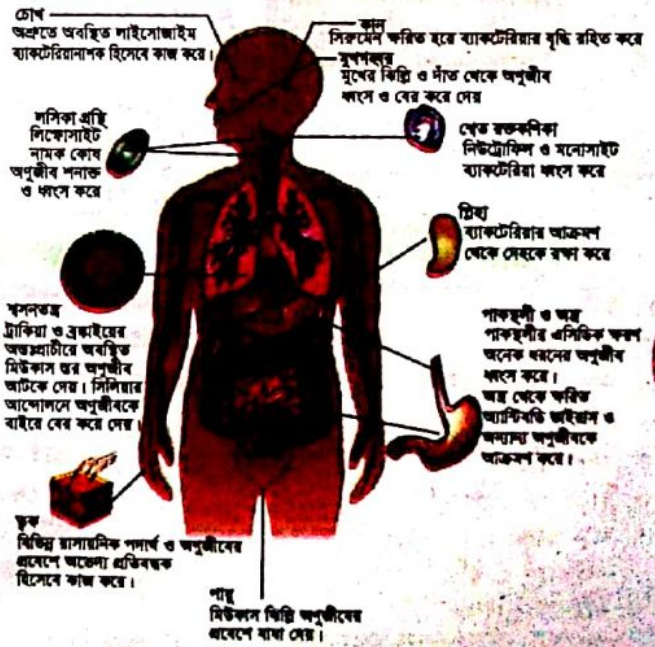

চিত্র ১০.১ (খ) : মানবদেহের বিভিন্ন প্রতিরক্ষা স্তর

৯। অ্যাপেনডিক্স (Appendix) : বৃহদন্ত্রের সিকামের সঙ্গে যুক্ত নলাকার গঠন বিশেষ।
১০। রক্তনালিসমূহ (Blood vessels) : দেহের সর্বত্র বিস্তৃত ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকাসমূহ।
১১। পেয়ার প্যাচ (Peyer's patches) : ক্ষুদ্রান্ত্রে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের লসিকা কলা।

জীবদেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
(Normal Disease defence mechanism of animal body)

মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। যথা–

(ক) সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা অনির্দেশিত অনাক্রম্যতা (Non specific defence mechanism/Non specific immunity) : এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জীবদেহে যেকোনো রকম অণুজীবের বা জীবাণুর বা পরজীবীর প্রবেশকে প্রতিরোধ করে। এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সহজাত বা জন্মগত অনাক্রম্য ব্যবস্থা (innate immunity or in-born immunity) বলা হয়। সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় দেহ একটি আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি নিয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত পন্থাগুলো হলো– দেহের ত্বক, শ্বাসনালি বা অন্ত্রনালির মিউকাস পর্দা, পাকস্থলীর ভেতর আম্লিক pH, প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাড়া, ফ্যাগোসাইট দ্বারা (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল ইত্যাদি) জীবাণু ভক্ষণ, দেহের তাপমাত্রা দ্বারা জীবাণু দমন প্রভৃতি।

(খ) সুনির্দিষ্ট বা নির্দেশিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা নির্দেশিত অনাক্রম্যতা (Specific defence mechanism/Specific immunity) : এটি এমন একটি সক্রিয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যার মধ্যমে নির্দিষ্টভাবে দেহে প্রবেশকৃত বিশেষ বিশেষ অণুজীব বা জীবাণু বা পরজীবী ধ্বংস হয়ে থাকে। একে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বা Immune System বলে। এই ব্যবস্থায় দেহের লিম্ফোসাইট (যেমন, B-লিম্ফোসাইট ও T-লিম্ফোসাইট) রোগজীবাণু ভক্ষণ করে কিংবা জীবাণুকে অ্যান্টিবডি উৎপাদন দ্বারা প্রতিরোধ করে। এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অভিযোজিত বা অর্জিত অনাক্রম্য ব্যবস্থা (adaptive or acquired immunity) বলা হয়।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্তর

রোগজীবাণু কিংবা পরজীবীর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পোষকদেহে (মানবদেহে) সাধারণভাবে তিন ধরনের প্রতিরক্ষা স্তর লক্ষ করা যায়, যথা– প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর, দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ও তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর। মানবদেহের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরকে সাধারণ বা নন-স্পেসিফিক বা সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরকে সুনির্দিষ্ট বা স্পেসিফিক বা অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলা হয়। মানবদেহে এ সকল ব্যবস্থা ভৌত, রাসায়নিক প্রতিবন্ধক ও প্রতিরক্ষা স্তর (Step of defence) হিসেবে সদা সতর্ক রয়েছে।

চিত্র ১০.২ : মানবদেহের প্রতিরক্ষা স্তর

বিভিন্ন প্রতিরক্ষা স্তরের অন্তর্গত উপাদানসমূহ

সাধারণ বা সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা		সুনির্দিষ্ট বা অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর	দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর	তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর
১. ত্বক ২. লোম ৩. সিলিয়া ও মিউকাস ৪. এসিড ৫. এনজাইম ৬. সিরুমেন ৭. রক্ত তঞ্চন ৮. মলত্যাগ ও বমি ৯. মাইক্রোবায়োম	১. ফ্যাগোসাইটিক কোষ ২. প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ ৩. কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র ৪. ইন্টারফেরন ৫. সাইটোকাইনস ৬. অ্যাকিউট ফেজ প্রোটিন ৭. প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাড়া ৮. দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি (জ্বর)	১. লিম্ফোসাইটস (B-লিম্ফোসাইট ও T-লিম্ফোসাইট) ২. অ্যান্টিবডি (IgA, IgD, IgE, IgG ও IgM) ৩. স্মৃতি কোষ/মেমোরি সেল (মেমোরি B-কোষ ও মেমোরি T-কোষ)

❑ কাজ : (i) ইমিউন সিস্টেমের ধারণার শ্রেণিবিন্যাস কর। (ii) মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ইমিউনতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

১০.২ প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর (First Step of Defence)

মানবদেহের প্রতিরক্ষায় যে প্রতিরক্ষা স্তর রাসায়নিক ও ভৌত বাহ্যিক তলীয় প্রতিবন্ধক হিসেবে বহিরাগত যেকোনো অণুজীব বা কণাকে দেহের ভেতর প্রবেশে বাধা দেয় তাকে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর বলে। আমাদের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য জীবাণুর বসবাস। এ জীবাণুদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। অসংখ্য জীবাণুর মাঝে বসবাস করেও আমরা কিন্তু সুস্থ থাকি। কারণ আমাদের দেহে রয়েছে তিন স্তরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর কোনো নির্দিষ্ট বহিরাগত বস্তুকে ক্ষতিকর হিসেবে টার্গেট না করে সব বহিরাগত পদার্থকেই ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করে দেহে প্রবেশে নিম্নোক্ত ভৌত রাসায়নিক প্রতিবন্ধকের মিলিত কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাই এ স্তরটিকে **অনির্দিষ্ট বা সাধারণ বা নন-স্পেসিফিক স্তরও** বলা হয়। এ প্রতিরক্ষার প্রথম স্তরে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো জীবাণু প্রতিরোধ করে থাকে।

১। ত্বক (Skin) : ত্বক দেহে অণুজীব প্রবেশের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। ত্বকীয় গ্রন্থি নিঃসৃত ঘাম ও তৈল ব্যাকটেরিয়ার জন্য বিষস্বরূপ। ত্বকে বিদ্যমান মিথোজীবী অণুজীব সংক্রমক অণুজীব প্রতিরোধ করে। ত্বকের হায়ালোরনিক এসিড (hyaluronic acid) অণুজীবদের জন্য অতি অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে যা এদের ধ্বংস করে।

২। লোম (Hairs) : নাকের মধ্যকার লোম বাতাস থেকে আসা ধুলা-ময়লা আটকে দেহের অভ্যন্তরের ক্ষতিকর পদার্থের প্রবেশ রোধ করে।

২। সিলিয়া ও মিউকাস (Cilia and Mucus) : শ্বাসনালিতে বিদ্যমান সিলিয়া ও মিউকাস অবিরাম ধূলিকণা ও অণুজীবদের হাঁচি (sneezing) ও কাশির (coughing) মাধ্যমে বের করে দেয়।

৩। এসিড (Acid- HCl) : পাকস্থলীতে বিদ্যমান হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাদ্যের সঙ্গে আগত বিভিন্ন অণুজীব ধ্বংস করে। যোনিতে বিদ্যমান মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া (*Lactobacillus* sp.) **ল্যাকটিক এসিড (lactic acid) উৎপন্ন** করে অণুজীবের সংক্রমণ রোধ করে।

৪। এনজাইম (Enzyme) : লালা, অশ্রু, মূত্র ও ঘামে বিদ্যমান **লাইসোজাইম এনজাইম, ফসফোলাইপেজ A** এবং হিস্টাটিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ দেহে আগত অধিকাংশ ক্ষতিকর অণুজীব ধ্বংস করে। এছাড়াও পাকস্থলীতে বিদ্যমান প্রোটিওলাইটিক এনজাইম খাদ্যের সাথে আগত বিভিন্ন অণুজীব ধ্বংস করে।

৫। সিরুমেন (Cerumen) : শ্রবণ অঙ্গের বহিঃকর্ণের কর্ণকূহর নামক অংশের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হলদে বাদামি রংয়ের মোমের মতো পদার্থকে সিরুমেন বলে। কানের পর্দার যেন ময়লা ও অণুজীবের সংক্রমণে শ্রবণে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য **সিরুমেনে আটকে শক্ত দলায় অর্থাৎ কানের খইল (earwax) এ পরিণত হয়।**

৬। রক্ত তঞ্চন (Blood clotting) : ক্ষতস্থানে দ্রুত রক্ত তঞ্চন ঘটে দেহে অণুজীব প্রবেশ রোধ করে।

৭। মলত্যাগ ও বমি (Defecation and vomiting) : দেহ হতে অনেক ক্ষতিকর অণুজীব মলত্যাগ ও বমির মাধ্যমে বের হয়ে যায়।

৮। মাইক্রোবায়োম (Microbiome) : আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী কিছু উপকারী অণুজীব রয়েছে যারা প্রতিনিয়ত রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবদের সাথে পুষ্টির জন্য প্রতিযোগিতা করে। এতে অনেকসময় রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

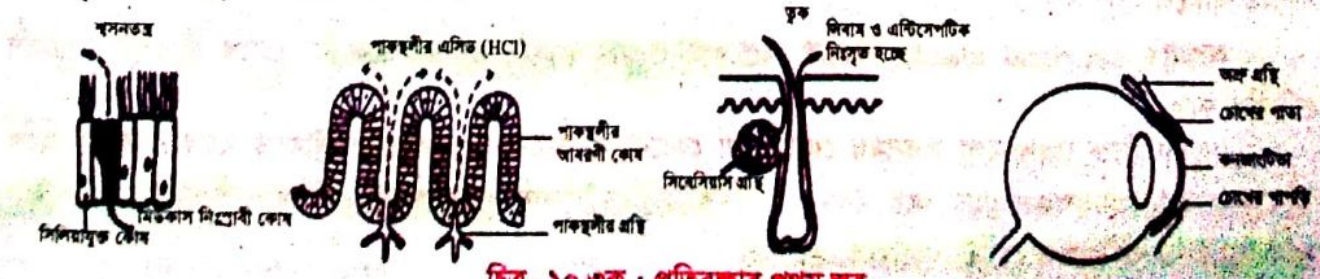

চিত্র- ১০.৩ক : প্রতিরক্ষার প্রথম স্তর

১০.২.১ দেহ প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা (Role of Skin in defence of the body)

মানবদেহের বাহিরের আবরণী হলো ত্বক। এটি মানবদেহের সর্ববৃহৎ অঙ্গ। এপিডার্মিস ও ডার্মিস নামক দুটি স্তর নিয়ে ত্বক গঠিত। ত্বকের অন্যতম কাজ হলো দেহের অন্তঃস্থ অঙ্গসমূহকে সংরক্ষণ করা ও দেহে জীবাণু সংক্রমণে বাধা দান করা। দেহে ত্বক প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

- ত্বক দেহকে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি এবং এর প্রভাবে সৃষ্ট রোগ (ক্যান্সার) হতে দেহকে রক্ষা করে। ত্বকের এপিডার্মিসের কোষে **মেলানিন** (melanin) জাতীয় পদার্থ সৃষ্টি হয় যা অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে।
- ত্বক দেহের বাইরের স্তরে দৃঢ় ও ক্যারাটিনাইজড (keratinized) আবরণী তৈরি করে, যা দেহের সকল ব্যাহ্যিক অংশকে আচ্ছাদিত করে এবং ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে একটি ফলপ্রসূ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

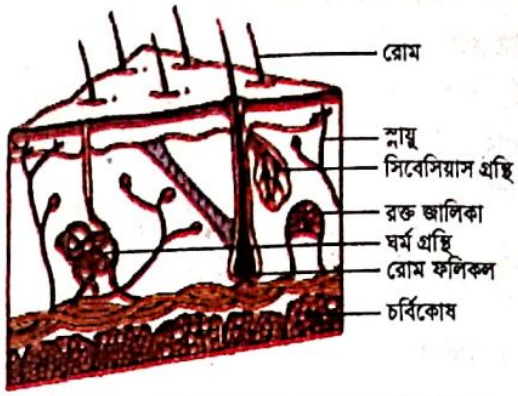

চিত্র- ১০.৩খ : মানুষের ত্বকের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)

- দেহত্বক ছিঁড়ে বা কেটে গিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হলে সেখানে দ্রুত জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে। ত্বকের কাটা স্থান থেকে নির্গত রক্তপ্রবাহ জীবাণুর অপসারণ ঘটায় এবং ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধায়, ফলে বাইরে থেকে অণুজীব দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। এছাড়াও ত্বকে অবস্থিত **হিস্টিওসাইট** (ম্যাক্রোফেজ) জীবাণু ধ্বংস করে দেহকে প্রতিরক্ষা দান করে।
- **ঘাম গ্রন্থি** (sweat gland) ও তৈল বা **স্বেদ গ্রন্থির** (sebaceous gland) নিঃসরণ (ঘাম ও তেল বা স্বেদ) ত্বকের উপরিভাগের pH-কে অম্লীয় (pH ৩.০-৫.০) করে তোলে, ফলে অণুজীবসমূহ বেশি সময় ত্বকে বেঁচে থাকতে পারে না। এছাড়া ঘাম গ্রন্থি ও স্বেদ গ্রন্থির নিঃসরণেও জীবাণুনাশক (অ্যান্টিবায়োটিক) বস্তু থাকে (ডার্মিসাইডিন নামে পেপটাইড), যার কারণে মানুষের ত্বক **আত্ম-রোগজীবাণুনাশক অঙ্গ** (self-disinfecting organ) হিসেবে কাজ করতে পারে। কিছু সংখ্যক উপকারী ব্যাকটেরিয়া ত্বকে অবস্থানকালে এসিড ও বিপাকীয় বর্জ্য নিঃসরণ করে, যা অণুজীবের সংখ্যাবৃদ্ধিকে বাধা দেয়।
- ঘাম নিঃসৃত লবণ ও ফ্যাটি এসিডে অবস্থিত **লাইসোজাইম** (lysozyme) ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীরকে ধ্বংস করে।
- ত্বকের কেরাটিনোসাইটস থেকে সাইটোকাইন, নিউরোপেপটাইড ও ইকোসানয়েড ক্ষরিত হয় যেগুলো বিভিন্ন জীবাণুর বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতায় সাড়া প্রদান করে।
- ত্বকে অন্য এক ধরনের অণুজীব প্রতিরোধী **পেপটাইড ক্যাথিলেসিডিন** (cathelicidins) শনাক্ত করা হয়েছে যা ত্বককে *Sterptococcus* এর সংক্রমণ হতে রক্ষা করে।
- কানের ভিতরে **সিরুমিনাস গ্রন্থি** (ceruminous gland, ত্বকীয় গ্রন্থি) থেকে নিঃসৃত **সিরুমেন** (cerumen) নামক মোমের মতো পদার্থ কানের ভেতর ধুলাবালি, ব্যাকটেরিয়া, ছোট পোকামাকড়ের প্রবেশ ও আক্রমণ থেকে কানের পর্দাকে রক্ষা করে।
- **অশ্রুগ্রন্থি** (lacrimal gland) নিঃসৃত অশ্রুতেও (tear) লাইসোজাইম থাকে যা চোখে জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিহত করে।
- দেহের সিক্ত অংশগুলো সবসময় কোনো না কোনো ব্যাকটেরীয় সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকে। অনেক অংশ আবার ব্যাকটেরিয়ানাশকও বহন করে, যেমন– নাসিকাঝিল্লি ও লালায় লাইসোজাইম; সিমেনে স্পার্মিন (spermin); দুধে ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ (lactoperoxidase) ইত্যাদি।

▪ ত্বকে সাধারণত নিউট্রোফিল থাকে না। কিন্তু কোনো জীবাণুর আক্রমণে যখন ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি হয় তখন অসংখ্য নিউট্রোফিলের আগমন ঘটে এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

যদিও ত্বক আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তবুও এটি দেহের সার্বিক প্রতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট নয়। ত্বক নিজেও বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক কিংবা ক্ষুদ্র পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ত্বকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংক্রমণ হলো– ফোড়া (boils), ছোঁয়াচে ঘা (impetigo), দাদ (ringworm), আঁচিল (wart), খোসপাঁচড়া (scabies), একজিমা (eczema), কচ্ছুরোগ (psoriasis) ইত্যাদি।

❑ কাজ : দেহের বাইরের বিশেষ কিছু অঙ্গের দেহ রক্ষায় ভূমিকা সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

১০.২.২ খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা
(Role of Digestive Acid and Enzyme in killing Food Bacteria)

আমরা খাদ্যের সাথে প্রতিনিয়ত অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অনেক অণুজীব গলাধঃকরণ করে থাকি। আমাদের দেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এসব ব্যাকটেরিয়া ও অণুজীবকে ধ্বংস করে আমাদের দেহকে সুস্থ রাখে। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর হিসেবে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

▪ মুখগহ্বরের লালারসের **লাইসোজাইম** (lysozyme) এনজাইম মুখে গৃহীত খাদ্য ও পানীয়তে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়াকে (*Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Enterococcus* ইত্যাদি) ধ্বংস করে।

▪ লাইসোজাইম, লালা ও লালায় উপস্থিত হাইড্রোজেন কার্বনেট আয়ন দাঁতের এসিডের উপস্থিতিকে প্রশমিত বা নিষ্ক্রিয় করে দাঁতের ক্ষয় (dental caries) রোধ করে। লালারসের অবিরাম ক্ষরণে মুখের অভ্যন্তরে বা দাঁতে খাদ্যকণা সঞ্চিত হতে পারে না, ফলে ব্যাকটেরিয়াও জন্মাতে পারে না।

▪ আর যেসব ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীব লালারস দ্বারা ধ্বংস হয় না তারা পাকস্থলীর প্রাচীরের প্যারাইটাল কোষ থেকে নিঃসৃত HCl এসিড দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পাকস্থলীরসে অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান লাইসোজাইমও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে থাকে।

▪ ক্ষুদ্রান্ত্রের হাইড্রোলাইটিক এনজাইম খাদ্যের ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবদের ধ্বংস করে।

▪ পাকস্থলী, অগ্নাশয়, ডিওডেনাম ও ইলিয়ামে উপস্থিত **প্রোটিয়েজ এনজাইম** খাদ্যের সাথে আগত ব্যাকটেরিয়ার দেহের প্রোটিন অংশকে ভেঙে ফেলে, ফলে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস হয়। এছাড়া প্রোটিয়েজ এনজাইম অ্যান্টিবায়োটিকসের সাথে **সিনারজিসটিক ক্রিয়া** (synergistic effect) করে অধিক কার্যকরভাবে ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

চিত্র ১০.৪ : প্রতিরক্ষায় পরিপাকনালির ভূমিকা

▪ মিউকাস গ্রন্থি ও লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **ল্যাকটোপারঅক্সিডেজ এনজাইম** (lactoperoxidase enzyme) গ্রাম পজেটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে প্রাকৃতিক ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করে।

▪ পিত্তাশয়ের পিত্ত (bile, pH 8.0) অন্ত্রের কাইমে (chyme) অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যম ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

▪ সমগ্র পরিপাকনালির অন্তঃপ্রাচীর মিউকাস দিয়ে আবৃত থাকে। এই মিউকাস পরজীবী বিধ্বংসী বস্তু, কারণ এতে Immunoglobulin G (IgG), IgA এবং লাইসোজোম উপস্থিত থাকে। IgG-একটি বিশেষ ধরনের অ্যান্টিবডি। এরা অন্ত্রের কোষীয় আবরণের উপর রক্ষণাত্মক স্তর সৃষ্টি করে এবং পরজীবীর আক্রমণ রোধ করে।

CamScanner

১০.৩ দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Second Step of Defence)

বাহ্যিকতলীয় প্রতিরক্ষা স্তর ভেদ করে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশকারী যেকোনো অণুজীব বা অণুকণার বিরুদ্ধে দেহাভ্যন্তরীণ কোষীয় ও রাসায়নিক প্রতিরক্ষা নিয়ে গঠিত যে স্তর সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাকে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর বলে। এটিও একটি **নন-স্পেসিফিক বা সহজাত** প্রতিরক্ষা স্তর। মানবদেহের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের উপাদানসমূহ হলো–

১। **ফ্যাগোসাইটিক কোষ** (Phagocytic cell) : দেহের প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোনো কারণে অকার্যকর হয়ে পড়লে ব্যাকটেরিয়া ত্বকের ক্ষতস্থান দিয়ে দেহে প্রবেশের সুযোগ পায়। এক্ষেত্রে ক্ষতস্থানের সূক্ষ্ম রক্তনালিকাগুলোর প্রসারণের ফলে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়। কৈশিক জালিকার ভেদ্যতা বৃদ্ধির ফলে শ্বেত রক্তকণিকা থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের **ফ্যাগোসাইটগুলো** (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল, মনোসাইট ইত্যাদি) আন্তঃকোষীয় ফাঁকে বের হয়ে আসে এবং অনুপ্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়াকে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গলাঃধকরণ করে।

কোনো কোনো ফ্যাগোসাইটের লাইসোজোমে বিদ্যমান এনজাইম দু'রকমের **কোষবিষ** (cytotoxin) তৈরি করে, যথা– **রিঅ্যাকটিভ অক্সিজেন ইন্টারমেডিয়েট** (ROIs) ও **রিঅ্যাকটিভ নাইট্রোজেন ইন্টারমেডিয়েট** (RNIs)। এদের ক্রিয়ায় দেহে প্রবেশকৃত অণুজীব, অন্য কোষ, বহিরাগত কণা বা পরজীবী ধ্বংস হয়ে যায়।

২। **প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ বা সহজাত মারণকোষ** (Natural Killer cells = NK cells) : এটি বিশেষ ধরনের লিম্ফোসাইট কিন্তু এরা ফ্যাগোসাইট নয়। ভাইরাস আক্রান্ত কোষ ও টিউমার কোষকে ধ্বংস করার জন্য এসব কোষ বিশেষায়িত। এরা অ্যান্টিজেনের উদ্দীপনা ছাড়াই সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ (যেমন– **সাইটোটক্সিন, পারফোরিন ও গ্রানাইজাইম** ইত্যাদি) ক্ষরণ করে সুনির্দিষ্ট কোষের (জীবাণুর) আবরণীতে ছিদ্র সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এসব ছিদ্র দিয়ে পানি প্রবেশ করে ফলে উহা ক্রমশ স্ফীত হয়ে ফেটে যায় এবং কোষের মৃত্যু ঘটে।

৩। **কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র** (Complement system) : রক্তের রক্তরস বা প্লাজমা মধ্যস্থ ২০-৩০টি সিরাম প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র বা সিস্টেম উদ্দীপিত হয়ে রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সৃষ্টি করে তাকে কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র বা সিস্টেম বলে। প্লাজমা প্রোটিনের প্রায় ১০% কমপ্লিমেন্ট তন্ত্রের অন্তর্গত। এ তন্ত্র গঠনকারী প্রোটিনকে **কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন** বলা হয়। এ প্রোটিনগুলো মনোসাইটস, হেপাটোসাইটস (যকৃৎ) ইত্যাদি কোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে প্লাজমায় ঘুরে বেড়ায়। এ তন্ত্রের ক্রিয়া সাধারণত **নন-স্পেসিফিক**, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পেসিফিকও হতে পারে। জীবাণু সংক্রমণে কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র সক্রিয় হয়ে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পন্ন করে। যেমন– (১) **কেমোট্যাক্সিস** পদার্থরূপে ফ্যাগোসাইটিক কোষগুলোকে (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল ইত্যাদি) ক্ষতস্থানে আসতে আকর্ষণ করে। (২) ম্যাক্রোফেজের **ফ্যাগোসাইটিক ধর্ম** বাড়িয়ে দেয়। (৩) ক্ষতস্থানে **প্রদাহ সৃষ্টি** করে জীবাণুর বৃদ্ধি ও বিস্তার রোধ করে। (৪) বেসোফিল ও মাস্টকোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের **হিস্টামিন** ক্ষরণ উদ্দীপিত করে। (৫) অপসোনিন হিসেবে কাজ করে **অপসোনাইজেশন** প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং (৬) সরাসরি জীবাণু বিদীর্ণ করে।

৪। **ইন্টারফেরন** (Interferon) : ইন্টারফেরন হলো এক ধরনের উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট (প্রায় ২০-৩০ হাজার ডাল্টন) গ্লাইকোপ্রোটিন যা ভাইরাস আক্রান্ত কোষ কর্তৃক নিঃসৃত হয়ে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি রোধ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই মানবদেহের অধিকাংশ কোষ ইন্টারফেরন উৎপন্ন করে। ইন্টারফেরনের সাধারণ উৎস হলো ভাইরাস আক্রান্ত **লিউকোসাইটস, T-লিম্ফোসাইট** এবং **ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ**। উৎপাদক কোষ হতে নিঃসৃত হয়ে ইন্টারফেরন আশেপাশের সুস্থ কোষে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে ভাইরাসবিরোধী প্রোটিন তৈরি করে তাদেরকে ভাইরাস প্রতিরোধী করে তোলে। এছাড়া ইন্টারফেরন আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করার জন্য কিছু প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ (NK cells) নিয়োগ করে। ইন্টারফেরন প্রধানত ভাইরাস প্রতিরোধ

করে, তবে ক্যান্সার ও টিউমার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিতেও বাধা দেয়। ইন্টারফেরনের কাজ অ্যান্টিবডির তুলনায় অনেক দ্রুত, তবে তার প্রভাব স্বল্পস্থায়ী। ইন্টারফেরন হেপাটাইটিস, ফুসফুসের ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার ইত্যাদি রোগের বিরুদ্ধে কার্যকরী। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী **Alick Isaac** এবং **J. Lindemann** (1957) ইন্টারফেরনের প্রবর্তক।

৫। **সাইটোকাইনস** (Cytokines) : অ্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া দিয়ে অনাক্রম্যতন্ত্রের কোষসমূহ যেসব বিশেষ ধরনের প্রোটিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের সাইটোকাইনস বলে। এরা মূলত এক প্রকার ক্ষুদ্র, দ্রবণীয়, নন-অ্যান্টিবডি জাতীয় গ্লাইকোপ্রোটিন। মানবদেহে ৬০ প্রকারের বেশি সাইটোকাইনস আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে ইন্টারলিউকাইন (interleukins), ইন্টারফেরন, গ্রোথ ফ্যাক্টর, লিম্ফোটক্সিন, লিম্ফোকাইন, পারফোরিন, লিউকোট্রিন উল্লেখযোগ্য। এরা অনাক্রম্যতন্ত্রে প্রধানত ৩ ভাবে কাজ করে থাকে। যেমন– (১) কেমোট্যাক্সিক এবং প্রদাহের মাধ্যমে সহজাত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। (২) লিম্ফোসাইট সক্রিয়করণের মাধ্যমে অর্জিত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) নতুন শ্বেত রক্তকণিকা উৎপাদনের মাধ্যমে হিমাটোপোয়সিস প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করা।

৬। **অ্যাকিউট ফেজ প্রোটিন** (Acute phase proteins-APPs) : এ ধরনের প্রোটিনগুলো সাধারণত রাসায়নিক ও কাজের দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। মানবদেহে কলার জখম, চরম সংক্রমণ, পোড়া বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহের কারণে রক্তের প্লাজমায় এদের ঘনত্বের ব্যাপক পরিবর্তন হয় অর্থাৎ বেড়ে যায় কিংবা কমে যায়।

৭। **প্রদাহ সৃষ্টিকারী সাড়া** (Inflammatory response) : সংক্রমিত স্থানে উৎপন্ন পুঁজ (pus) হচ্ছে রক্তরসে অবস্থিত মৃত কোষ, নিষ্ক্রিয় ব্যাকটেরিয়া ও ফ্যাগোসাইটের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবশেষ। ফ্যাগোসাইটোসিসের (phagocytosis) পরিণতি প্রকাশ পায় যখন সংক্রমণের স্থানটি গাঢ় লাল বর্ণের হয়ে স্ফীত হয়। রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ত্বকের ওই অঞ্চলে লালচে ভাব ফুটে ওঠে।

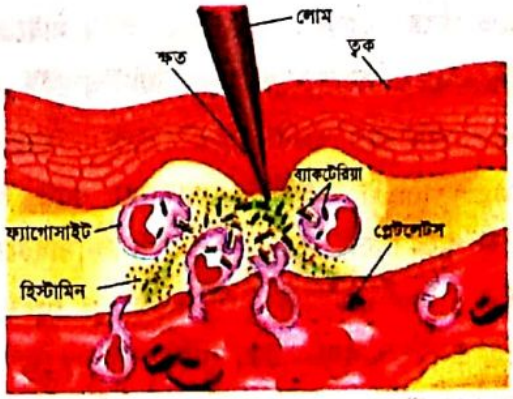

চিত্র ১০.৫ : মানবদেহের দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর

লসিকাবাহিত ব্যাকটেরিয়া ও ফ্যাগোসাইট লসিকা গ্রন্থিতে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে গলাধঃকরণের মাধ্যমে নিষ্কাশিত করে। লিম্ফোসাইট ও ক্ষতিগ্রস্ত কলা নিঃসৃত **হিস্টামিন** (histamin) এর প্রভাবে রক্তের কৈশিক জালিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রদাহ সৃজনক্ষম প্রতিক্রিয়া (inflamentory response) দেখা যায়।

৮। **দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা জ্বর** (Increase body temperature or fever) : দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের শেষ অস্ত্র হচ্ছে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা জ্বর। কোনো সংক্রমণের কারণে দেহের তাপমাত্রা যখন স্বাভাবিকের (97-99°F অর্থাৎ 36-37.2°C) চেয়ে বেড়ে যায় তখন তাকে জ্বর বলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেহের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তাপমাত্রা হচ্ছে অণুজীব ও শ্বেতকণিকার মধ্যকার সংঘর্ষের বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের প্রদাহ অধিকতর বিস্তৃত এবং একে **Systemic reaction** বলে। উচ্চ তাপমাত্রার জ্বর শুধু জীবাণুর বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে তা নয়, কখনো কখনো এরা আসলে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও ক্রিয়াশীল করে তোলে বটে, অবশ্য যদি না তা অতিরিক্ত পর্যায়ের অসুবিধা ঘটায়। এক্ষেত্রে দুটি কারণে জ্বর হয়ে থাকে, প্রথমত রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব দ্বারা নিঃসৃত বিষক্রিয়া, দ্বিতীয়ত পাইরোজেন (pyrogen) নামক রাসায়নিক পদার্থ (fever producing substance) যা শ্বেতকণিকা থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে। কম বা মাঝারি ধরনের জ্বর (102-104°F) দেহের উপকারই করে। যে জ্বর দুদিনের বেশি স্থায়ী হয় কিংবা 100°F ছাড়িয়ে যায় তখনই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

CamScanner

ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলসের ভূমিকা
(Role of Macrophage and Neutrophils in killing Bacteria)

ম্যাক্রোফেজ (Macrophage, Gr. *makros* = large ; *phagein* = eat, i.e. big eaters)

মনোসাইট বৃহৎ আকৃতির শ্বেত রক্তকণিকা। এদের ব্যাস ১০μm-২০μm। এদের নিউক্লিয়াস অপেক্ষাকৃত ছোট, ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার এবং সাইটোপ্লাজম বেশি, স্বচ্ছ ও দানাহীন। এরা দেহের মোট শ্বেত রক্তকণিকার প্রায় ৫%। এরা চলমান ফ্যাগোসাইট (mobile phagocyte) এবং ক্ষণপদ গঠনে সক্ষম। এরা অস্থিমজ্জায় বৃদ্ধি লাভ করে এবং রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। রক্তে মাত্র ১০-২০ ঘণ্টা থাকার পর এরা ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়।

ম্যাক্রোফেজ

ম্যাক্রোফেজ বিশেষ প্রকার শ্বেতকণিকা, যা **মনোসাইট** (monocyte) থেকে উৎপন্ন হয়। মনোসাইট রক্তের বাইরে বৃহদাকার (ব্যাস ৬০μm-৮০μm) অর্থাৎ ৫ গুণ বড় আকার ধারণ করে ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়। **রেটিকিউলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম** (Reticuloendothelial System) বা **মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইট সিস্টেমের** (Mononuclear phagocyte system) ভেতর (যেমন– অস্থিমজ্জা, যকৃৎ, প্লিহা, লিম্ফ নোড ও সাইনাস ইত্যাদির ভেতর) ম্যাক্রোফেজ ঘুরে বেড়ায় (৪০ মাইক্রোমিটার/মিনিট গতিতে)। এমনকি **ভ্রাম্যমাণ কোষ** (wandering cells) হিসেবেও এরা কলার ভেতর বিচরণ করতে পারে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভেতর **মাইক্রোগ্লিয়া** (microglia), যকৃৎ রক্তনালির ভেতর **কুফার কোষ** (kuffer cell), যোজক কলার মধ্যে আবদ্ধ **হিস্টিওসাইট** (histiocytes) বিভিন্ন প্রকার ম্যাক্রোফেজ।

এ ধরনের কোষ, জীবাণুকে **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) পদ্ধতিতে আত্মসাৎ করে জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। এটা ছাড়াও B ও T লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করে অনাক্রম্যতামূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এ কারণে ম্যাক্রোফেজকে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। ম্যাক্রোফেজগুলো প্রাথমিকভাবে দেহে প্রবিষ্ট জীবাণুকে ভক্ষণ করে ধ্বংস করে। তা ছাড়াও অনাক্রম্যতা সৃষ্টিতে এরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

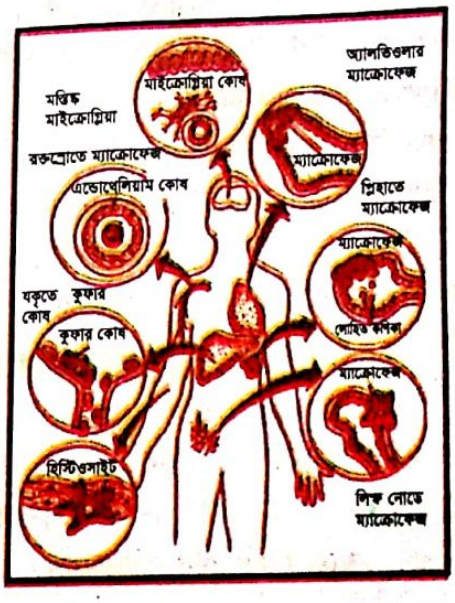

চিত্র ১০.৬ক : মানবদেহে ম্যাক্রোফেজের বিচরণক্ষেত্র

দেহত্বক ভেদ করে রোগজীবাণু কোষকলায় পৌঁছানো মাত্রই প্রতিক্রিয়া হিসেবে সেখানে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। ফলে দেহের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধীরে ধীরে উক্ত প্রদাহস্থলে ম্যাক্রোফেজ এসে জড়ো হতে থাকে। একেকটি ম্যাক্রোফেজ প্রায় ১০০টির মতো ব্যাকটেরিয়া গ্রাস করতে পারে, কখনওবা সম্পূর্ণ লোহিত কণিকা, ছত্রাক বা ম্যালেরিয়ার জীবাণুর মতো বড় পদার্থও গ্রাস করে।

ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক জীবাণু ধ্বংসের প্রক্রিয়া : ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক উৎপাদিত প্রোটিন দু'ভাবে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করে। যেমন–

(ক) ভৌত পদ্ধতিতে : ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়ার দেহ প্রাচীরে গর্ত বা ছিদ্র করে ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে।

(খ) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় : যে প্রক্রিয়ায় ফ্যাগোসাইটসমূহ ভক্ষণের মাধ্যমে অণুজীব ধ্বংস করে তাকে ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) বলে। ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়ার দেহের বাইরের দিকে আঠার মতো লেগে থেকে অন্যান্য ম্যাক্রোফেজকে ফ্যাগোসাইটোসিসের জন্য আহ্বান জানাতে থাকে। ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু নিধন নিম্নলিখিত পর্যায়ক্রমিক ধাপে সম্পন্ন হয়।

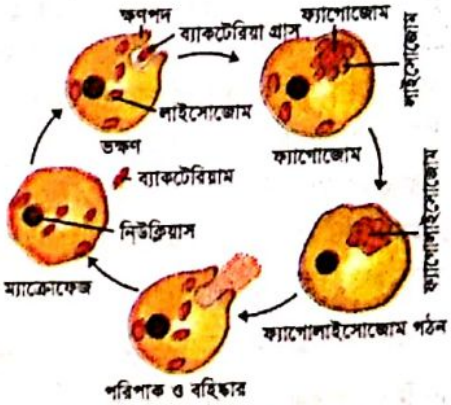

চিত্র ১০.৬খ : ম্যাক্রোফেজের ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া

১। **সংক্রমিত স্থানে ফ্যাগোসাইটিক কোষের আগমন বা মুক্ত হওয়া** (Delivery of phagocytic cells to the site of infection) : প্রথমে ম্যাক্রোফেজ কেমোট্যাক্সিস (chemotaxis) ও ডায়াপেডিসিস (diapedisis) প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে আক্রান্ত স্থানে উপস্থিত হয়।

২। **অণুজীবের সাথে সংলগ্নীকরণ** (Attachment of microorganisms) : অতঃপর ব্যাকটেরিয়া ও ম্যাক্রোফেজ নিকটবর্তী হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে। একে সংলগ্নীকরণ বলা হয়। ম্যাক্রোফেজের প্লাজমা আবরণীর কিছু রাসায়নিক গ্রাহক পদার্থ অণুজীবদের সাথে সংযুক্ত হয়ে ফ্যাগোসাইটিক প্রক্রিয়া শুরু করে।

৩। **গ্রাসকরণ বা ভক্ষণ** (Ingestion) : ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ম্যাক্রোফেজ ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য রোগজীবাণুকে দেহাভ্যন্তরে টেনে নেয় বা গ্রাস করে। অর্থাৎ এ সময়ে ম্যাক্রোফেজ অণুজীবের চারদিকে ক্ষণপদ সৃষ্টি করে এটিকে ঘিরে ফেলে এবং পরিশেষে ইনভ্যাজিনেশন (invagination) প্রক্রিয়ায় সাইটোপ্লাজমের ভেতরে নিয়ে আসে। এ প্রক্রিয়াকে **গ্রাসকরণ বা ভক্ষণ বা ইনজেশন** বলে।

৪। **ফ্যাগোজোম গঠন** (Formation of phagosome) : ভক্ষণের পর দু'পাশ থেকে আগত ক্ষণপদের অগ্রভাগ একীভূত হয়ে কোষঝিল্লিবেষ্টিত থলিকার মধ্যে ব্যাকটেরিয়াকে আবদ্ধ করে। এভাবে সৃষ্ট ঝিল্লিবেষ্টিত খাদ্যগহ্বরকে **ফ্যাগোজোম** (phagosome) বলে।

৫। **ফ্যাগোলাইসোজোম গঠন** (Formation of phagolysosome) : ফ্যাগোজোম ম্যাক্রোফেজের সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত এক বা একাধিক **লাইসোজোম** (lysosome)-এর সাথে যুক্ত হয়ে **ফ্যাগোলাইসোজোম** (phagolysosome) গঠন করে।

৬। **অণুজীবদের অন্তঃকোষীয় মরণ** (Intracellular killing of microorganisms) : ফ্যাগোলাইসোজোম গঠিত হওয়ায় কয়েক মিনিটের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া তার প্রজনন ক্ষমতা হারায়। অতঃপর ১০-৩০ মিনিটের মধ্যে লাইসোজোমাল এনজাইমের প্রভাবে ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু ঘটে।

৭। **অণুজীবদের অন্তঃকোষীয় পরিপাক ও বহিষ্কার** (Intracellular digestion and discharge of microorganisms) : মৃত ব্যাকটেরিয়ার উপর বিভিন্ন পরিপাক এনজাইম যেমন– লাইসোজাইম, লাইপেজ, নিউক্লিয়েজ ও গ্লাইকোলাইজ প্রভৃতির ক্রিয়া করে উহার অন্তঃকোষীয় পরিপাক সম্পন্ন করে। পরিপাকের পর নিউট্রোফিল জাতীয় ফ্যাগোসাইট মারা যায় ও পুঁজ কোষরূপে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়। অপরপক্ষে, পরিপাকের পর ম্যাক্রোফেজ জাতীয় ফ্যাগোসাইট উৎপন্ন বিষাক্ত পদার্থ ও অপাচ্য অংশ ত্যাগ করে নতুন ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হয়।

[বি.দ্র. : একইভাবে নিউট্রোফিলের ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেওয়া যাবে।]

ম্যাক্রোফেজের অনাক্রম্যতায় সাড়াদান (Response of Macrophage Immunity)

ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ ছাড়াও ম্যাক্রোফেজ B ও T-লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করে অনাক্রম্যতামূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ কারণে ম্যাক্রোফেজকে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। আমাদের দেহের প্রতিটি কোষের প্লাজমা পর্দায় MHC (Major Histocompatibility Complex) মার্কার প্রোটিন থাকে। ম্যাক্রোফেজ নিজের MHC প্রোটিনের সঙ্গে দেহের অন্যান্য কোষের MHC প্রোটিনের তুলনা সাপেক্ষে আপন কোষগুলোকে শনাক্ত করতে পারে।

বহিরাগত কোনো জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে MHC প্রোটিনের তুলনা সাপেক্ষে ম্যাক্রোফেজ তাদের চিনতে পারে। ভাইরাস ও অন্যান্য বহিরাগত বিষাক্ত পদার্থও এদের দ্বারা চিহ্নিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, MHC প্রোটিন MHC জিন দ্বারা সংশ্লেষিত হয় এবং আঙুলের ছাপের মতো একজনের MHC প্রোটিনের সঙ্গে অপরের প্রোটিনের কোনো মিল পাওয়া যায় না। বহিরাগত জীবাণু, পরজীবী কোষ বা ভাইরাস প্রভৃতি ম্যাক্রোফেজের সংস্পর্শে এলে ম্যাক্রোফেজ হতে **ইন্টারলিউকিন-1** (interleukin-1) নামক প্রোটিন নিঃসৃত হয় এবং উহার প্রভাবে লিম্ফোসাইট কোষগুলো উদ্বুদ্ধ হয়ে অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া জাগায়।

এছাড়া ম্যাক্রোফেজ কর্তৃক ভক্ষিত হয়ে জীবাণু পাচিত হলে উহার কিছু প্রোটিন (অ্যান্টিজেন) ম্যাক্রোফেজের প্লাজমা পর্দায় MHC প্রোটিনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এ অবস্থায় এটি লিম্ফোসাইট কর্তৃক চিহ্নিত হয় ও সক্রিয় হয়ে ওঠে।

নিউট্রোফিলস (Neutrophils)

নিউট্রোফিল মানবদেহের সহজাত রোগ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার এক অত্যাবশ্যকীয় অংশ। মানুষের রক্তে যে শ্বেত রক্তকণিকা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তা হলো নিউট্রোফিল (৬০-৭০%) অর্থাৎ প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে এদের সংখ্যা ৩-৬ হাজার। এদের নিউক্লিয়াস ২-৭ খণ্ডকবিশিষ্ট এবং এর সাইটোপ্লাজম বর্ণ-নিরপেক্ষ দানাযুক্ত, যেগুলো ইওসিন রঞ্জকে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। এরা ক্ষুদ্র সক্রিয় ফ্যাগোসাইট। যার জন্য এদেরকে কখনো **মাইক্রোফাজ** (microphage) বলা হয়। এদের ব্যাস ১০μm -১৪μm। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে দৈনিক প্রায় ১০ হাজার কোটি (১০০ বিলিয়ন) নিউট্রোফিল উৎপন্ন হয়। এরা বহিরাগত বিভিন্ন অণুজীবদের প্রধানত **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় গ্রাস করে এবং ধ্বংস করে। মৃত অণুজীব এবং নিউট্রোফিল একত্রে পুঁজ গঠন করে। এদের জীবনকাল ২-৪ দিন।

নিউট্রোফিল

নিউট্রোফিল কর্তৃক জীবাণু ধ্বংসের প্রক্রিয়া : নিউট্রোফিল প্রধানত তিন ধরনের প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবদের নিধন করে। যথা–

১। **ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় :** ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ফ্যাগোসাইটিক নিউট্রোফিলস কলাকোষের মধ্য দিয়ে দেহের যেকোনো অংশে প্রবেশ করতে পারে এবং ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। এ কাজে T-লিম্ফোসাইট থেকে নিঃসৃত হরমোনসদৃশ রাসায়নিক পদার্থ, যেমন– ইন্টারলিউকিন, লিউকোট্রিন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব রাসায়নিক পদার্থকে **সাইটোকাইনস** (cytokines) বলে। সাইটোকাইনসের প্রভাবে রক্তনালিকা প্রসারিত ও ছিদ্রময় হয়ে ওঠে। ফলে নিউট্রোফিল এসব ছিদ্র দিয়ে রক্তজালিকায় অন্তরাবরণী আস্তরণের যেকোনো একটি সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে এ কোষগুলো মুহূর্তে তাদের **প্রোটোপ্লাজমীয় ক্ষণপদ** (pseudopodium) প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং প্রোটোপ্লাজমের অর্ধতরল পদার্থকে ক্ষণপদের দিকে ঠেলে দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়। এ পদ্ধতিতে খুব কম সময়ের (প্রায় ১ মিনিট) মধ্যেই অসংখ্য রক্তকণিকা রক্তপ্রবাহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। দেহের যে অংশে ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে সেখানে পৌঁছেই তারা বিপদাপন্ন অঞ্চলকে ঘিরে ফেলে এবং ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে শুরু করে। প্রতিটি কোষ প্রায় ৩-২০টি রোগজীবাণুকে গ্রাস করতে সক্ষম। এদের জীবন্ত অবস্থায়ই তারা গ্রাস করে। এরপর সেটি নিজেই নিষ্ক্রিয় হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

চিত্র ১০.৭ : ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে শ্বেত রক্তকণিকা (নিউট্রোফিল) দ্বারা জীবাণু ভক্ষণ

২। **প্রোটিওলাইটিক এনজাইম দ্বারা** : ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও নিউট্রোফিল প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (যেমন– লেকটোফেরিন, লাইসোজাইম, কোলাজিনেজ, ক্যাথিলিসিডিন ইত্যাদি) নিঃসরণ করে যা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গিলে ফেলা জীবাণুর (ফ্যাগোজোম) সঙ্গে মিশে গিয়ে **ফ্যাগোলাইসোজোম** তৈরি হয়, যেখানে রোগজীবাণু মারা পড়ে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৩। **ভৌত পদ্ধতিতে** : এ পদ্ধতিতে নিউট্রোফিল রক্তনালির মধ্যে DNA গঠনের অনুরূপ জালকাকৃতির এক ধরনের বহিঃকোষীয় ফাঁদ (Neutrophil Extracellular Traps- NETs) তৈরি করে ব্যাকটেরিয়াকে নিধন করে। নিউট্রোফিল, প্রোটিন (সিরাইন প্রোটিয়েজ) ও ক্রোমাটিনের সমন্বয়ে গঠিত উক্ত জালে ব্যাকটেরিয়া আটকা পড়ার পর সেখানেই তাদের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ এ পদ্ধতি ভৌত উপায়ে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করে।

ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিলের মধ্যে পার্থক্য

ম্যাক্রোফেজ	নিউট্রোফিল
১। ম্যাক্রোফেজ বিশেষ ধরনের অদানাদার শ্বেত রক্তকণিকা।	১। নিউট্রোফিল দানাদার শ্বেত রক্তকণিকা।
২। মনোসাইট রক্তের বাইরে বৃহদাকার ধারণ করে ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়।	২। নিউট্রোফিল কোনো রক্তকণিকার পরিবর্তিত রূপ নয়।
৩। এরা B ও T-লিম্ফোসাইটকে উদ্বুদ্ধ করে অনাক্রম্যতামূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি করতে সক্ষম।	৩। এরা সক্ষম নয়।
৪। এরা সাধারণত ২টি প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে থাকে। যথা– ভৌত ও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায়।	৪। এরা সাধারণত ৩টি প্রক্রিয়ায় জীবাণু ধ্বংস করে থাকে। যথা– ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায়, প্রোটিওলাইটিক এনজাইম দ্বারা এবং ভৌত প্রক্রিয়ায়।

❑ **কাজ** : (i) ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে এনজাইম, এসিড, ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল বিশেষ ভূমিকা রাখে– উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। (ii) মানবদেহের সুস্থতার জন্য দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরটি অপরিহার্য– বিশ্লেষণ কর।

১০.৪ তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Third Step of defence)

যে প্রতিরক্ষা স্তর দেহে অনুপ্রবেশকারী সুনির্দিষ্ট ধরনের বহিরাগত রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব বা কণা বা ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে এবং প্রথমবার আক্রান্ত হওয়ার পর এসব নির্দিষ্ট ক্ষতিকর টার্গেটকে আজীবন মনে রেখে পরবর্তী যেকোনো আক্রমণের সময় দ্রুত ও কার্যকর সাড়া দেয় তাকে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর বলে। এই স্তরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডটি ইমিউন সাড়া নামে পরিচিত। **অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া** (immune response) তৃতীয় স্তরীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত এবং এটি নির্দিষ্টভাবে (In specific way) প্রতিরক্ষা প্রদান করতে পারে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জীবাণু বা পরজীবীর বিরুদ্ধে কিংবা বিশেষ কোনো অ্যান্টিজেন প্রতিরোধের জন্য এই ব্যবস্থায় ভিন্ন রকমের প্রতিহত পন্থা দেখা যায়। **অর্জিত অনাক্রম্যতা** এ স্তরের অন্তর্গত। মানবদেহের তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের উপাদানসমূহ হলো :

১। **লিম্ফোসাইট** (Lymphocytes) : লিম্ফোসাইট এক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা। এগুলো অনাক্রম্যতন্ত্রের প্রধান কোষ এবং তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের প্রধান উপাদান। উৎপত্তির ভিত্তিতে লিম্ফোসাইট প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে, যথা- **T-লিম্ফোসাইট** ও **B-লিম্ফোসাইট**।

(ক) **T-লিম্ফোসাইট** (T-Lymphocytes or T-cells) : যে সব লিম্ফোসাইট অস্থিমজ্জায় স্টেম কোষ বা স্টেম সেল (stem cell) থেকে উৎপন্ন হয়ে থাইমাস গ্রন্থিতে পরিণতি লাভ করে, তাদেরকে T-লিম্ফোসাইট বা **T-কোষ** বলে। এরা ক্ষুদ্র লিম্ফোসাইট নামেও পরিচিত। এরা কোষীয় অনাক্রম্যতা সৃষ্টির জন্য দায়ী। প্রাথমিক অবস্থায় এ কোষগুলো

ভ্রূণের লাল অস্থিমজ্জায় স্টেম কোষ থেকে সৃষ্টি হয়। এরপরে কোষগুলো ভ্রূণের থাইমাস গ্রন্থিতে প্রবেশ করে পরিণত হয় এবং T-লিম্ফোসাইট বা T-কোষ গঠন করে। T-কোষ ৪ ধরনের, যথা–

(i) হেলপার T-কোষ (Helper T-cells) : এরা কিলার T-কোষ ও সাপ্রেসর T-কোষগুলোকে সক্রিয় করে এবং B-লিম্ফোসাইটকে অ্যান্টিবডি সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এছাড়া এরা অ্যান্টিজেন ধ্বংসকারী প্রোটিন **সাইটোকাইন** বা **লিম্ফোকাইন** (cytokine or lymphokine) নিঃসৃত করে ম্যাক্রোফেজের ফ্যাগোসাইটিক ধর্ম বাড়িয়ে দেয়। HIV এ হেলপার T-কোষগুলোকে ধ্বংস করায় দেহ AIDS রোগে আক্রান্ত হয়। এদের বহিঃতলে CD4+ নামক অনন্য ধরনের অ্যান্টিজেন থাকে। এরা সাধারণত ২ প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন– TH_1 ও TH_2।

(ii) কিলার T-কোষ (Killer T-cells) : এরা দেহে সরাসরি অনুপ্রবিষ্ট বিজাতীয় বস্তু বা জীবাণুদের ধ্বংস করে। এ কোষগুলো পারফোরিন (parforin) ক্ষরণের দ্বারা জীবাণুর কোষঝিল্লিকে ছিদ্র করে দেয় এবং এসব ছিদ্রের মাধ্যমে আক্রান্ত কোষে টক্সিক পদার্থের (লিম্ফোটক্সিন) অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদেরকে সরাসরি ধ্বংস করে কিংবা অন্যান্য কোষ থেকে তরল এসব ছিদ্র দিয়ে কোষে প্রবেশ করে, ফলে কোষ স্ফীত হয়ে বিদীর্ণ হয় এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এছাড়া এরা ক্যান্সার কোষ, টিউমার কোষ, ভাইরাস আক্রান্ত কোষ এবং প্রতিস্থাপিত টিস্যুর কোষও এভাবে ধ্বংস করে। এদেরকে **সাইটোটক্সিক বা ইফেক্টর কোষ** (Cytotoxic or Effector clls)-ও বলা হয়।

(iii) সাপ্রেসর T-কোষ (Suppressor T-cells) : এ কোষগুলো হেলপার T-কোষ দ্বারা সক্রিয় হয়। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে এসে গেলে এরা T-কোষ ও B-কোষের কার্য বন্ধ করে দেয়। এছাড়া এরা পোষক দেহের নিজস্ব কোষগুলোকে অনাক্রম্য তন্ত্রের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এ কোষের জন্যই একই প্রাণীর নিজস্ব অ্যান্টিজেন দ্বারা অ্যান্টিবডির কোনো বিক্রিয়া ঘটে না। **AIDS রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের এ কোষের সংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পায়।** হেলপার T-কোষ ও সাপ্রেসর T-কোষকে **রেগুলেটর কোষ** (regulator cells)-ও বলা হয়।

(iv) মেমোরি T-কোষ (Memory T-cells) : যেসব T-কোষ নির্দিষ্ট জীবাণু বা অ্যান্টিজেনকে দীর্ঘদিন স্মরণে রেখে দ্বিতীয় সংক্রমণের সময় ধ্বংস করে, তাদেরকে **মেমোরি বা স্মৃতি T-কোষ** বলে। এরা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং লসিকাতন্ত্রে (প্লিহা, লসিকাগ্রন্থি, লসিকা কলা) বহুদিন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। এরা গৌণ বা সেকেন্ডারি অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে অর্থাৎ এদের ইমিউনিটি ধর্ম সুপ্ত থাকে যতদিন না পর্যন্ত দ্বিতীয়বার একই অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে আসে। সক্রিয়তার সময় এ কোষগুলো দেহের ইমিউনতন্ত্রকে অতি দ্রুত কার্যকর করে এবং জীবাণুকে সরাসরি আক্রমণ ও ধ্বংস করে।

(খ) B-লিম্ফোসাইট (B-Lymphocytes or B-cells) : যেসব লিম্ফোসাইট কোষ অস্থিমজ্জার স্টেম সেল থেকে উৎপন্ন হয়ে অস্থিমজ্জাতেই পরিণতি লাভ করে এবং লসিকা গ্রন্থিতে অবস্থান করে, তাদের **B-লিম্ফোসাইট** বা **B-কোষ** বলে। এরা রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে এরা সক্রিয় হয় এবং অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। অর্থাৎ এরা **রসভিত্তিক বা হিউমোরাল ইমিউনিটির সঙ্গে জড়িত**।

বিশ্রামরত অবস্থায় T-কোষ ও B-কোষ একই রকম দেখায়, তবে কোষ সক্রিয় হলে T-কোষ ও B-কোষ (এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে) শনাক্ত করতে অসুবিধা হয় না। পাখিদের ক্ষেত্রে **বার্সা ফ্যাব্রিসিয়াস** (Bursa of Fabricius) নামক লিম্ফাটিক অঙ্গ (যাহা ক্লোয়েকার কাছে অবস্থিত) হতে B-কোষ উৎপন্ন হয় বলে এদের এমন নামকরণ হয়েছে। অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীতে বার্সা নামক অঙ্গের উপস্থিতি দেখা যায় না। তবে সমতুল কোনো অঙ্গে এদের B-কোষ প্রস্তুত হয় বলে মনে করা হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহে এই কোষ অস্থিমজ্জায় সৃষ্টি হলেও যকৃৎ ও প্লিহা এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের লসিকা গ্রন্থিতে পরিণত হয়। B-কোষ দু'রকমের হয়, যথা– **প্লাজমা কোষ ও মেমোরি B-কোষ**।

(i) প্লাজম কোষ (Plasma cells) : কিছু সক্রিয় B-কোষ বড় হয়ে বিভাজিত হয় এবং প্লাজমা কোষে বা প্লাজমা B-কোষে রূপান্তরিত হয় এবং প্লাজমা কোষের ক্লোন গঠন করে। প্লাজমা কোষগুলো একই ধরনের অসংখ্য (প্রতি সেকেন্ডে ২০০০টি) অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে এবং অ্যান্টিবডি দ্বারা জীবাণুকে ধ্বংস করে বা জীবাণু নিঃসৃত টক্সিনকে নিষ্ক্রিয় করে। কোষগুলো ৪-৫ দিন অ্যান্টিবডি ক্ষরণের পর মারা যায়। প্লাজমা কোষ মূলত প্লিহা, টনসিল, লসিকাগ্রন্থি, লসিকা কলা ও অ্যাপিওলার যোজক কলার পরিবর্তিত B-কোষ।

(ii) মেমোরি B-কোষ (Memory B-cells) : যেসব B-কোষ নির্দিষ্ট জীবাণু বা অ্যান্টিজেনকে দীর্ঘদিন স্মরণে রেখে দ্বিতীয় সংক্রমণের সময় ধ্বংস করে, তাদেরকে মেমোরি বা স্মৃতি B-কোষ বলে। কিছু সক্রিয় B-কোষ প্লাজমা কোষে রূপান্তরিত না হয়ে মেমোরি B-কোষে রূপান্তরিত হয়। এদের বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা প্রায় মেমোরি T-কোষের মতোই, তবে কার্যকারিতায় পার্থক্য হলো, এরা খুব দ্রুত অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে জীবাণু বা অ্যান্টিজেন ধ্বংস বা নিষ্ক্রিয় করে।

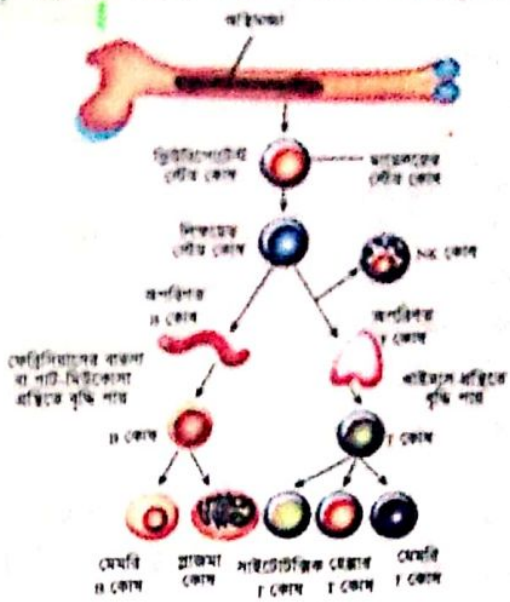

চিত্র ১০.৮ : বিভিন্ন প্রকার লিম্ফোসাইটের উৎপত্তিস্থল ও পরিণতি

২। অ্যান্টিবডি (Antibody) : অ্যান্টিবডি হলো নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের উদ্দীপনায় প্লাজমা কোষ বা প্লাজমা B-কোষ কর্তৃক সৃষ্ট এক প্রকার গ্লাইকোপ্রোটিন। সব অ্যান্টিবডিই গামা গ্লোবিউলিন নামে পরিচিত। প্লাজমাপ্রোটিনের প্রায় ২০% হলো অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন। তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের মূল চালিকাশক্তি হলো এই অ্যান্টিবডি। তবে এদের কাজের জন্য ফ্যাগোসাইটিক কোষ এবং কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের সহায়তার প্রয়োজন হয়। এরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অ্যান্টিজেন বা জীবাণু ধ্বংস বা নিষ্ক্রিয়করণ করে এবং দেহে নির্দিষ্ট রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি গড়ে তোলে। [বিস্তারিত পৃষ্ঠা- ৪২৫]

৩। মেমোরি সেল (Memory cells) বা স্মৃতি কোষ : যেসব লিম্ফোসাইট নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন বা জীবাণুকে দীর্ঘদিন স্মরণ রেখে দ্বিতীয় সংক্রমণের সময় ধ্বংস করে, তাদেরকে মেমোরি সেল বা স্মৃতি কোষ বলে। এরা প্রাণিদেহে গৌণ বা সেকেন্ডারি অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে থাকে। মেমোরি সেল দুই প্রকার, যথা– মেমোরি T-কোষ ও মেমোরি B-কোষ। [বিস্তারিত পৃষ্ঠা- ৪১৭ ও ৪৩৫]

T-লিম্ফোসাইট ও B-লিম্ফোসাইটের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	T-লিম্ফোসাইট	B-লিম্ফোসাইট
১। উৎপত্তি স্থান	এরা অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাইমাস গ্রন্থিতে পরিণতি লাভ করে।	এরা স্তন্যপায়ী প্রাণীর অস্থিমজ্জায় উৎপন্ন হয় এবং সেখানেই পরিণতি লাভ করে এবং পরে লসিকা গ্রন্থিতে অবস্থান করে।
২। প্রদত্ত ইমিউনিটি	কোষনির্ভর অনাক্রম্যতা।	রসনির্ভর অনাক্রম্যতা।
৩। কোষ উপরিতলে	অ্যান্টিবডি থাকে না।	অ্যান্টিবডি থাকে।
৪। ক্ষরিত বস্তু	সাইটোকাইনস (লিম্ফোকাইনিন)।	অ্যান্টিবডি।
৫। উপজাত কোষগোষ্ঠী	সাইটোটক্সিক T-লিম্ফোসাইট, সাহায্যকারী T-লিম্ফোসাইট, সাপ্রেসর T-লিম্ফোসাইট, স্মৃতি T-কোষ প্রভৃতি।	প্লাজমা কোষ এবং মেমোরি কোষ (স্মৃতি B-কোষ)।
৬। কাজ	সরাসরি জীবাণুকে ধ্বংস করে।	অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে ধ্বংস করে।

CamScanner

অনাক্রম্যতন্ত্রের সাধারণ শ্রেণিবিভাগ :

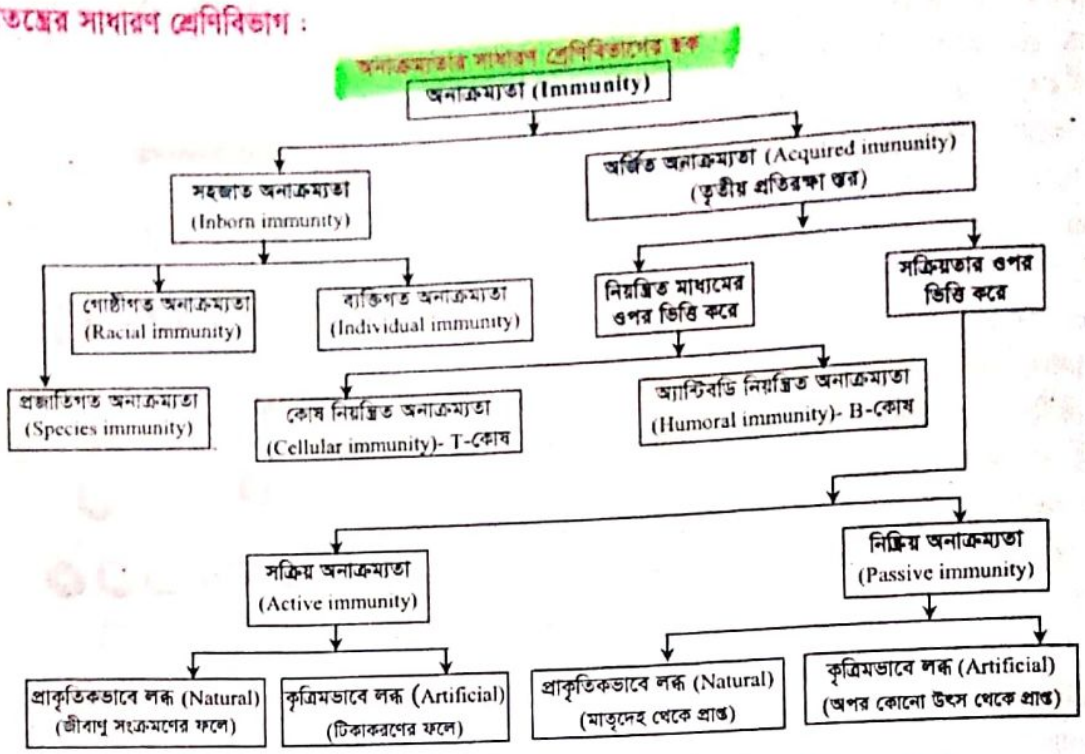

(১) সহজাত অনাক্রম্যতা (Inborn or Innate or Natural Immunity)

যে অনাক্রম্যতা জন্মের সময় থেকে বংশপরম্পরায় সঞ্চালিত হয় এবং দেহের সাধারণ ও স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম, তাকে সহজাত অনাক্রম্যতা বলে। এ রকম অনাক্রম্যতা জন্মগত। এটি বিশেষ কোনো রোগজীবাণুর (অ্যান্টিজেন) বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট নয়। এটি দেহের সাধারণ ও স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যা জন্ম থেকেই রোগ বা জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী। এজন্য একে **বস্তু নিরপেক্ষ** বা **নন-স্পেসিফিক অনাক্রম্যতাও** (non-specific immunity) বলে।

উদাহরণ– ত্বক, মিউকাস পর্দা, পাকস্থলীর আম্লিক pH, ক্ষরিত লালারস, চোখের পানি, শ্বসনতন্ত্রের সিলিয়া, রক্তকণিকা (ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল), মাস্ট কোষ, বেসোফিল কোষ, NK cell প্রভৃতি দ্বারা এই অনাক্রম্যতা রোগ বা জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

জিনগত গঠনের ভিত্তিতে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয় বলে এটিকে **বংশগত বা জিনগত অনাক্রম্যতাও** (genetic immunity) বলা হয়। এই অনাক্রম্যতা বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে পোলিও, হাম, কলেরা, আমাশয়, ভাইরাসজনিত পক্ষাঘাত, মাম্পস, সিফিলিস প্রভৃতিকে রোধ করতে পারে।

এটি নিম্নে বর্ণিত ধরনের হতে পারে, যেমন–

১। **প্রজাতিগত অনাক্রম্যতা** (Speices immunity) : বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরজীবী বা জীবাণুর আক্রমণ বিশেষ প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ ধরনের অনাক্রম্যতাকে প্রজাতিগত অনাক্রম্যতা বলে। উদাহরণ : ম্যালেরিয়ার পরজীবী (*Plasmodium vivax*) মানুষ ও মশকীর (*Anopheles* sp.) উপর পরজীবী, কিন্তু অন্য কোনো প্রজাতির উপর বাঁচতে পারে না।

২। **গোষ্ঠীগত অনাক্রম্যতা** (Racial immunity) : কোনো বিশেষ পরজীবীর মাধ্যমে মানুষের কোনো কোনো গোষ্ঠী আক্রান্ত হয়ে থাকে। আবার অপর গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ পরজীবীটির আক্রমণ সহজেই প্রতিরোধ করে। উদাহরণ : কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা শ্বেতাঙ্গ মানুষের চেয়ে বেশি যক্ষ্মার শিকার হয়। এ ধরনের অনাক্রম্যতা গোষ্ঠীগত অনাক্রম্যতার অন্তর্ভুক্ত।

৩। **ব্যক্তিগত অনাক্রম্যতা** (Individual immunity) : কোনো কোনো মানুষ নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য পরজীবীর সংক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। এ ধরনের অনাক্রম্যতা ব্যক্তিগত অনাক্রম্যতার অন্তর্ভুক্ত।

সহজাত অনাক্রম্যতা প্রতিরোধ গড়ার পদ্ধতি : এ প্রকার অনাক্রম্যতা নিম্নলিখিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে–

১। আগ্রাসন বা ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) : RE তন্ত্রের (Reticuloendothelial System) আগ্রাসন বা ফ্যাগোসাইটিক কোষ, রক্তের মনোসাইট, নিউট্রোফিল, যকৃতের কুফার কোষ, সংযোগী কলার হিস্টিওসাইট, প্লিহা, লসিকাগ্রন্থি, থাইমাস গ্রন্থির জালককোষ সক্রিয় আগ্রাসন পদ্ধতিতে রোগজীবাণু ধ্বংস করে। এ ছাড়া প্রদাহ স্থানে আগ্রাসক কোষ প্রবেশ করে স্বাভাবিক অনাক্রম্যতায় অংশগ্রহণ করে।

২। এসিড ও উৎসেচক (Acid and enzyme) : পাকস্থলীতে গৃহীত জীবাণু পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও পাচক এনজাইম দ্বারা বিনষ্ট হয়।

৩। ত্বক ও শ্লেষ্মা ঝিল্লি (Skin and mucus membrane) : ত্বক তার কঠিন বহিঃস্তরের মাধ্যমে দেহে রোগজীবাণু প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। নাসিকার মিউকাস স্তর রোগজীবাণুকে মুখবিবরে লালার মধ্যে ঠেলে দেয়। তখন রোগজীবাণু গলাধঃকৃত হয়ে পাকস্থলীতে আসে এবং এসিডের সংস্পর্শে বিনষ্ট হয়।

৪। রাসায়নিক পদার্থ (Chemical compound) : কিছু রাসায়নিক পদার্থ জীবাণু বিনাশে অংশগ্রহণ করে, যেমন–

(১) **লাইসোজাইম :** এটি একরকম মিউকোলাইটিক পলিস্যাকারাইড জাতীয় পদার্থ, যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। লাইসোজাইম সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebro Spinal Fluid-CSF), ঘাম এবং মূত্র ছাড়া কলারস এবং প্রায় সমস্ত প্রকার ক্ষরণ পদার্থে থাকে। (২) **বেসিক পলিপেপটাইড :** এ পদার্থটি কোনো কোনো গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া করে ও তাদের নিষ্ক্রিয় ও বিনষ্ট করে। (৩) **প্রোপারডিন :** এটি একটি বৃহদাকার প্রোটিন, যা গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলো বিনষ্ট করে। (৪) **অ্যান্টিবডি :** এরা রক্তের স্বাভাবিক অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে এরা উৎপন্ন হয় এবং বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও প্রতিবিষকে ধ্বংস করে। (৫) **স্বাভাবিক কিলার সেল্ বা NK cell :** এরা এক ধরনের লিম্ফোসাইট, এরা বিভিন্ন বিজাতীয় কোষ, টিউমার কোষ প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে।

সহজাত অনাক্রম্যতা সৃষ্টির পদ্ধতি : সহজাত অনাক্রম্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলো দু'ভাবে কাজ করে, যেমন– **বাহ্যিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা** এবং **অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা**।

(ক) বাহ্যিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা (External Defence Mechanism) : এরকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিম্নলিখিত প্রকারের–

১। ভৌত প্রতিবন্ধক (Physical barriers) : এ ধরনের প্রতিবন্ধক জীবাণুদের ভেতরে প্রবেশে বাধা দেয়। যেমন-

(i) **দেহত্বক :** আমাদের ত্বকের কঠিন বহিরাবরক (stratum corneum) দেহের উপরিতলে আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে, ফলে রোগজীবাণু দেহের ভেতরে প্রবেশে বাধা দেয়।

(ii) **নাসাবিবরস্থ রোম :** নাসিকার মধ্যে যে রোম থাকে তা ধূলিকণা, পরাগরেণু এবং কিছু জীবাণুকে ভেতরে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে।

(iii) **মিউকাস পর্দা :** শ্বাসনালি, খাদ্যনালি প্রভৃতির মিউকাস পর্দা এবং সিলিয়া একত্রে বিজাতীয় বস্তুগুলোকে গলবিলে পাঠায় এবং পরবর্তীতে পাকস্থলীতে গিয়ে HCl ও এনজাইম বা উৎসেচকের ক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়।

২। শারীরবৃত্তীয় প্রতিবন্ধক (Physiological barriers) : এগুলো হলো–

(i) **দেহের তাপমাত্রা :** দেহের মধ্যে কোনো জীবাণু সংক্রামিত হলে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে জীবাণুদের মৃত্যু ঘটায়।

(ii) **NK cell :** এরা বিশেষ ধরনের লিম্ফোসাইট কোষ। এরা টিউমার কোষ ও অন্যান্য বিজাতীয় কোষদের বিনষ্ট করে।

(iii) **এসিড :** খাদ্যনালির মধ্যে গৃহীত জীবাণু পাকস্থলী রসে অবস্থিত HCl কর্তৃক ধ্বংস হয়।

(iv) **ঘাম ও সিবাম :** ঘর্মগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত ঘাম ও সিবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত সিবাম ক্ষরণের মাধ্যমে দেহ থেকে অনেক জীবাণু নিঃসৃত হয়ে যায়।

(v) **লাইসোজাইম :** অশ্রু, লালারস ইত্যাদিতে অবস্থিত লাইসোজাইম ব্যাকটেরিয়াদের বিনষ্ট করে।

(vi) **পিত্ত :** পিত্তরসে বিদ্যমান বিভিন্ন অজৈব ও জৈব উপাদান জীবাণুদের বৃদ্ধি রোধ করে।

(vii) **সেরুমেন :** কর্ণকুহরে অবস্থিত সেরুমিনাল গ্রন্থির ক্ষরণকে সেরুমেন বলে। এটি চটচটে আঠালো হওয়ায় বহিরাগত জীবাণু কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে এতে আটকে যায় এবং নিষ্ক্রিয় হয়।

(খ) অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Internal Defence Mechanism) : এরকম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হলো–

১। **শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Corpuscles-WBC)** : নিউট্রোফিল, মনোসাইট শ্বেতকণিকাগুলো ডায়াপেডেসিস ও ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগজীবাণুদের ধ্বংস করে। বেসোফিল শ্বেতকণিকা হিস্টামিন ক্ষরণ করে রোগজীবাণুদের ধ্বংস করে।

২। **ম্যাক্রোফেজ (Macrophage)** : RE তন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন কোষ, যেমন– যকৃতের **কুফার কোষ**, যোজককলার **হিস্টিওসাইট কোষ**, অস্থির **অস্টিওসাইট কোষ** রোগজীবাণু ও মৃত কোষগুলোকে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করে।

৩। **প্রদাহজনিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Inflammatory immunity)** : কোনো কারণে দেহের কোনো স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হলে সেই স্থানে প্রদাহ দেখা দেয়। অর্থাৎ আক্রান্ত স্থানটি **ফুলে যায়, লাল হয়, তাপ বৃদ্ধি পায়** এবং **যন্ত্রণা** অনুভূত হয়। রক্তজালক থেকে প্লাজমা কলাস্থানে সঞ্চিত হওয়ায় স্থানটি ফুলে যায়। প্লাজমাস্থিত সিরাম প্রোটিন (গামা ইমিউনোগ্লোবিউলিন) প্রদাহ স্থানের জীবাণুর টক্সিন বস্তুর গাঢ়ত্ব হ্রাস করে। অপরপক্ষে, আক্রান্ত স্থানের প্রসারিত রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে বিভিন্ন প্রকার ফ্যাগোসাইটিক কোষ (মনোসাইট, নিউট্রোফিল) বাইরে এসে জীবাণুদের গ্রাস করে।

৪। **কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র (Complement system)** : রক্তের রক্তরস বা প্লাজমা মধ্যস্থ ২০-৩০টি সিরাম প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র বা সিস্টেম উদ্দীপিত হয়ে রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সৃষ্টি করে তাকে কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র বলে। প্লাজমা প্রোটিনের প্রায় ১০% কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের অন্তর্গত। কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন যকৃতের হেপাটোসাইট, ম্যাক্রোফেজ, শ্বেতকণিকায় (মনোসাইট), পরিপাক নালি ও মূত্র-জনন নালিতে সংশ্লেষিত হয়। জীবাণু সংক্রমণে কমপ্লিমেন্ট তন্ত্র সক্রিয় হয়ে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পন্ন করে। এ তন্ত্র সহজাত ও অর্জিত অনাক্রম্যতা উভয় ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়। কমপ্লিমেন্ট তন্ত্রের অন্তর্গত প্রোটিনকে C_1, C_2, C_3, C_4 রূপে চিহ্নিত করা হয়।

৫। **ইন্টারফেরন (Interferon)** : ইন্টারফেরন হলো এক ধরনের উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট (প্রায় ২০-৩০ হাজার ডাল্টন) গ্লাইকোপ্রোটিন যা ভাইরাস আক্রান্ত কোষ কর্তৃক নিঃসৃত হয়ে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি রোধ করে। ইন্টারফেরনের সাধারণ উৎস হলো ভাইরাস আক্রান্ত **লিউকোসাইটস, T-লিম্ফোসাইট** এবং **ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ**। ইন্টারফেরন প্রধানত ভাইরাস প্রতিরোধ করে, তবে ক্যান্সার ও টিউমার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধিতেও বাধা দেয়।

সহজাত অনাক্রম্যতন্ত্রের প্রধান কাজ

(১) সংক্রমণ-স্থানে অনাক্রম্য কোষগুলোকে নিযুক্ত করে **সাইটোকাইনস** (cytokines)-এর মতো রাসায়নিক দূত উৎপাদন করা। (২) কমপ্লিমেন্ট তন্ত্রকে সক্রিয় করে ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করা এবং মৃত কোষ পরিষ্কার করা। (৩) অঙ্গ, কলা, রক্ত বা লসিকাতে উপস্থিত বহিরাগত বস্তুগুলোকে বিশেষ শ্বেত রক্তকণিকা দিয়ে শনাক্ত করা ও বর্জন করা। (৪) অর্জিত অনাক্রম্যতন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলা।

(২) অর্জিত অনাক্রম্যতা বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Acquired Immunity)

যেসব অনাক্রম্যতা সহজাত নয়, জন্মের পর দেহে রোগজীবাণু প্রবেশের ফলে সৃষ্টি হয় তাদের অর্জিত অনাক্রম্যতা বলে। এটি তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের (Third line of Defence) অন্তর্গত। এই রকম অনাক্রম্যতা প্রাণীর জন্মের পর অর্থাৎ প্রাণীর জীবদ্দশায় অর্জিত হয়। কোনো ক্ষতিকর অণুজীব কিংবা ক্ষতিকর পদার্থের প্রভাবে বা অন্য কোনো কারণে দেহে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ দেহের প্রয়োজনে যে অনাক্রম্যতার আবির্ভাব ঘটে সেটাই হচ্ছে অর্জিত অনাক্রম্যতা বা স্পেসিফিক অনাক্রম্যতা। অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আবার নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়–

১। নিয়ন্ত্রিত মাধ্যমের ওপর ভিত্তি করে অর্জিত অনাক্রম্যতা : দুই প্রকার, যথা–

(ক) কোষনির্ভর অনাক্রম্যতা বা কোষ নিয়ন্ত্রিত অনাক্রম্যতা (Cellular Immunity or Cell Mediated Immunity) : দেহে যে অনাক্রম্যতা T-লিম্ফোসাইট বা T-কোষের সাহায্যে ঘটে তাকে কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা বলে। এ ধরনের অর্জিত অনাক্রম্যতায় T-শ্রেণির লিম্ফোসাইট সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অনুপ্রবিষ্ট রোগজীবাণু ধ্বংস করে। লোহিত মজ্জা থেকে T-লিম্ফোসাইট সৃষ্টিকারী কোষ থাইমাস গ্রন্থিতে প্রবেশ করে T-লিম্ফোসাইটে পরিণত হয় এবং লসিকা গ্রন্থিতে আশ্রয় লাভ করে। দেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলে তাকে ম্যাক্রোফেজ গ্রাস করে। T-লিম্ফোসাইট ম্যাক্রোফেজযুক্ত অ্যান্টিজেনকে গ্রহণ করে এবং লিম্ফোকাইনিন এনজাইমের সাহায্যে তাদের ধ্বংস করে।

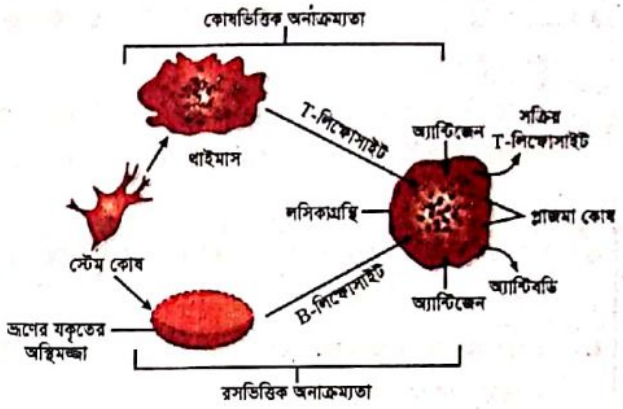

চিত্র ১০.৯: কোষনির্ভর অনাক্রম্যতা ও হিউমোরাল অনাক্রম্যতা চিত্ররূপ

(খ) রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা বা হিউমোরাল অনাক্রম্যতা বা অ্যান্টিবডি নিয়ন্ত্রিত অনাক্রম্যতা (Humoral immunity or Antibody mediated immunity) : দেহে যে অনাক্রম্যতা B-লিম্ফোসাইটের বা B-কোষ এর সাহায্যে ঘটে তাকে রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা বলে। B-লিম্ফোসাইট এ ধরনের অনাক্রম্যতার সঙ্গে যুক্ত। রক্তে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করার পর B-লিম্ফোসাইট তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়। অ্যান্টিজেনের প্রভাবে B-লিম্ফোসাইট কোষ ব্লাস্ট কোষে পরিণত হয় এবং ব্লাস্ট কোষ থেকে **প্লাজমা কোষ** (plasma cell) তৈরি হয়। প্লাজমা কোষ অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন সৃষ্টি করে এবং জীবাণুকে ধ্বংস করে।

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়– (i) অ্যান্টিজেনের প্রভাবে অ্যান্টিবডি অণুজীব বা বিজাতীয় বস্তুগুলোকে **দলবদ্ধ** করে, ফলে ম্যাক্রোফেজ সহজেই তাদের ভক্ষণ করে। (ii) দ্রবীভূত অ্যান্টিজেন অণুকে অ্যান্টিবডি দলবদ্ধ করে তাদের **অধঃক্ষেপণ** ঘটায়, ফলে ফ্যাগোসাইটিক কোষগুলো তাদের ভক্ষণ করে। (iii) অ্যান্টিজেন নিঃসৃত টক্সিন অ্যান্টিবডি নিঃসৃত **অ্যান্টিটক্সিন** দ্বারা প্রশমিত হয়।

প্রাথমিক ও গৌণ সাড়া (Primary and Secondary response) : রসভিত্তিক ও কোষভিত্তিক এ দু'প্রকার অনাক্রম্যতাই নিম্নলিখিত দুটি পদ্ধতিতে কাজ করে।

১। **প্রাথমিক সাড়া** (Primary response) : আমাদের অনাক্রম্যতা তন্ত্রটি যখন প্রথমবার কোনো নতুন বহিরাগত অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে আসে, তখন অনাক্রম্যতা তন্ত্রটি যে ক্রিয়াপদ্ধতি অবলম্বন করে ওই অ্যান্টিজেনের (বিজাতীয় বস্তু) বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাকে **প্রাথমিক সাড়া** বলে। এটি একটি ধীরগতির প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রাথমিক সাড়ার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অনাক্রম্যতা তন্ত্রের অপেক্ষাকৃত বেশি সময় লাগে এবং এই সাড়া তথা উদ্দীপনা ক্ষণস্থায়ী হয়।

২। **গৌণ সাড়া** (Secondary response) : অনাক্রম্যতা তন্ত্রটি যদি দ্বিতীয়বার একই অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে আসে তখন যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তাকে **গৌণ সাড়া** বা **সেকেন্ডারি সাড়া** বলে। গৌণ সাড়া প্রাথমিক সাড়ার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী এবং অনেক দ্রুত কার্যকরী হয়। প্রধানত প্রাথমিক সাড়ার ফলে সৃষ্ট **মেমোরি কোষই** (memory cells) এই গৌণ সাড়ার জন্য দায়ী।

CamScanner

কোষভিত্তিক ও রসভিত্তিক অনাক্রম্যতার মধ্যে পার্থক্য

কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা	রসভিত্তিক অনাক্রম্যতা
১। এ প্রকার অনাক্রম্যতায় T-লিম্ফোসাইট ও ম্যাক্রোফেজ প্রধান ভূমিকা পালন করে।	১। এ প্রকার অনাক্রম্যতায় B-লিম্ফোসাইট প্রধান ভূমিকা পালন করে।
২। মুখ্যত লিম্ফোকাইনিন, ইন্টারফেরন ও অ্যান্টিবডি সংশ্লেষের মাধ্যমে অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে এইরকম অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে।	২। মুখ্যত অ্যান্টিবডি সংশ্লেষ ও ক্ষরণের মাধ্যমে অ্যান্টিজেনের (জীবাণু) বিরুদ্ধে এইরকম অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে।
৩। বিশেষ কয়েক ধরনের অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে এ রকম অনাক্রম্যতা পরিলক্ষিত হয়।	৩। সাধারণত সব ধরনের অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে এ ধরনের অনাক্রম্যতা দেখা যায়।
৪। এ ধরনের অনাক্রম্যতা মুখ্যত কোষের মাধ্যমে এবং কিছুটা দেহতরলের মাধ্যমে ঘটে।	৪। এ ধরনের অনাক্রম্যতা দেহরস, রক্তরস, লসিকা ও কলারসের মাধ্যমে ঘটে।
৫। ক্যান্সারে এ অনাক্রম্যতা সুরক্ষা প্রদান করে।	৫। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এ অনাক্রম্যতা কার্যকরী হয় না অর্থাৎ সুরক্ষা প্রদান করে না।
৬। এ অনাক্রম্যতা ট্রান্সপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সাড়া দেয় অর্থাৎ কাজ করে।	৬। এ অনাক্রম্যতা ট্রান্সপ্ল্যান্টের ক্ষেত্রে সাড়া দেয় না।

২। সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে অনাক্রম্যতা : দুই প্রকার, যথা–

(ক) সক্রিয় বা প্রত্যক্ষ অনাক্রম্যতা (Active immunity) : দেহে প্রবিষ্ট বিজাতীয় বস্তুর (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা বিজাতীয় প্রোটিন) বিরুদ্ধে প্রাণিদেহে যে অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে তাকে **সক্রিয় বা প্রত্যক্ষ অনাক্রম্যতা** বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণিদেহে (যেমন– মানুষ) এমন কিছু ব্যবস্থা থাকে, যা দেহে জীবাণু অনুপ্রবেশের পরে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে রোগের জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় অনাক্রম্যতার অন্তর্ভুক্ত। এই অনাক্রম্যতার পরিচায়ক হচ্ছে T-লিম্ফোসাইট দ্বারা জীবাণু দমন কিংবা B-লিম্ফোসাইট কর্তৃক অ্যান্টিবডি ক্ষরণের মাধ্যমে জীবাণু দমন।

সক্রিয় অনাক্রম্যতার প্রধানত বৈশিষ্ট্য

১। যে অনাক্রম্যতা দেহে সরাসরি সক্রিয়ভাবে উৎপন্ন হয় তাকে সক্রিয় অনাক্রম্যতা বলে।

২। সক্রিয় অনাক্রম্যতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

৩। এ ধরনের অনাক্রম্যতায় নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় পরে উপশম ঘটে।

৪। এ ধরনের অনাক্রম্যতায় কোনো পার্শ্বীয় প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

প্রকারভেদ (Types) : সক্রিয় অনাক্রম্যতাকে আবার দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা–

(১) প্রাকৃতিকভাবে লব্ধ সক্রিয় অনাক্রম্যতা (Naturally acquired active immunity) : আমাদের দেহে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশ করলে তার অ্যান্টিজেন নামক পদার্থের প্রভাবে রক্তের T ও B লিম্ফোসাইট সক্রিয় হয়ে ওঠে। সক্রিয় লিম্ফোসাইটগুলোর প্রভাবে ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিহত হয়। তা ছাড়াও সক্রিয় লিম্ফোসাইটগুলো সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্মৃতিকোষ (memory cell) সৃষ্টি করে, যেগুলো রক্তের মধ্যে দীর্ঘদিন মজুদ থাকে ও ভবিষ্যতে আগের মতো জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে তাদের সহজে ও দ্রুত দমন করে ফেলে। রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে দেহে গঠিত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রাকৃতিকভাবে লব্ধ সক্রিয় অনাক্রম্যতা বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি বসন্ত হলে উক্ত ভাইরাসের বিরুদ্ধে যে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে সারাজীবন ধরে অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে, ফলে লোকটির দ্বিতীয়বার আর বসন্ত হয় না। অনুরূপভাবে পোলিও, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের বিরুদ্ধেও দেহে এ ধরনের অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয়।

CamScanner

(২) কৃত্রিম উপায়ে লব্ধ সক্রিয় অনাক্রম্যতা (Artificially acquired active immunity) : এ রকম অনাক্রম্যতা প্রতিষেধক প্রয়োগ দ্বারা (vaccination) সৃষ্টি করা যায়। ভ্যাকসিন (vaccine) বা টিকা হলো নিষ্ক্রিয় জীবাণু বা অ্যান্টিজেন (attenuated antigens)। দেহে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে, নিষ্ক্রিয় জীবাণু বা অ্যান্টিজেন কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে দেহের T ও B-লিম্ফোসাইট সক্রিয় হয়ে ওঠে ও বিশেষ জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক সব ব্যবস্থাই জেগে ওঠে। কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস-B প্রভৃতি রোগের বিরুদ্ধে দেহে এই প্রকার অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা হয়।

(খ) নিষ্ক্রিয় বা অক্রিয় বা পরোক্ষ অনাক্রম্যতা (Passive immunity) : এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রাণী নিজ দেহে সক্রিয়ভাবে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি না করে জীবাণু দমনের জন্য অন্য কোনো প্রাণী থেকে অ্যান্টিবডি লাভ করে।

নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১) যে অনাক্রম্যতা দেহের বাইরে থেকে কোনো উপাদান দেহে প্রবেশ করিয়ে সৃষ্টি করা হয়, তাকে নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা বলে। (২) নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার প্রভাব স্বল্পস্থায়ী। (৩) এ ধরনের অনাক্রম্যতায় রোগ সংক্রামণ থেকে দ্রুত উপশম ঘটে। (৪) এ ধরনের অনাক্রম্যতায় পার্শ্বীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

প্রকারভেদ (Types) : নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতাকেও দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা–

(১) প্রাকৃতিগতভাবে লব্ধ পরোক্ষ/নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা (Naturally acquired passive immunity) : এ ধরনের অনাক্রম্যতা জন্মগতভাবে মাতৃদেহ থেকে সন্তানে অর্জিত হয়। মাতৃগর্ভে শিশু অমরার (placenta) মাধ্যমে মাতৃদেহ থেকে অ্যান্টিবডি (IgG) অর্জন করতে পারে ও এর সাহায্যে অপরিণত শিশু জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধে সক্ষম হয়। এটা ছাড়াও শিশু মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে (বিশেষত কলোস্ট্রামের মাধ্যমে) IgA জাতীয় অ্যান্টিবডি প্রাপ্ত হয়। এটা শিশুর দেহে জীবাণু দমনে সহায়তা করে।

(২) কৃত্রিম উপায়ে লব্ধ পরোক্ষ অনাক্রম্যতা (Artificially acquired passive immunity) : এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে প্রথমে মানুষ বা অন্য প্রাণীর দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়ে অনেক ক্ষেত্রে রোগজীবাণু প্রতিরোধের জন্য প্রতিষেধক (vaccine) বা অ্যান্টিবডি তৈরি করা হয়। এই প্রতিষেধক বা অ্যান্টিবডি দ্বারা মানবদেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

এ প্রতিরোধ ব্যবস্থার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জলাতঙ্ক প্রতিরোধের জন্য **অ্যান্টির‍্যাবিজ** (antirabies) প্রতিষেধকের ব্যবহার। অথবা, সাপের বিষ (অ্যান্টিজেন) প্রতিহত করার জন্য প্রয়োজনীয় **অ্যান্টিভেনাম** (অ্যান্টিবডি) প্রয়োগ করে রোগীর দেহে কৃত্রিমভাবে লব্ধ পরোক্ষ বা নিষ্ক্রিয় অর্জিত অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে অধিক শক্তিশালী, নিরাপদ ও উন্নত প্রতিষেধক (vaccine) তৈরির চেষ্টা চলছে। যার একটি সাফল্য হচ্ছে– DNA কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে হেপাটাইটিস ভাইরাসের (hepatitis virus) সফল ভ্যাকসিন প্রস্তুত।

অর্জিত অনাক্রম্যতন্ত্রের প্রধান কাজ

(১) বিশেষ কোষের মাধ্যমে জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করা। (২) একদা সংক্রমিত নির্দিষ্ট জীবাণুকে মনে রাখা ও পরবর্তীকালে সেই জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করা। (৩) জীবাণুর ভবিষ্যৎ আক্রমণের জন্য দেহকে প্রস্তুত রাখা।

সহজাত অনাক্রম্যতা ও অর্জিত অনাক্রম্যতার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সহজাত অনাক্রম্যতা	অর্জিত অনাক্রম্যতা
১। অনাক্রম্যতা সৃষ্টির সময়	জন্ম থেকেই এ অনাক্রম্যতা কাজ করে।	এ অনাক্রম্যতা জন্মের পরে অর্জিত হয়।
২। বংশপরম্পরা	এ অনাক্রম্যতা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ বংশগত।	এ অনাক্রম্যতা বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না অর্থাৎ বংশগত নয়।
৩। গড়ে ওঠা	রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগেই গড়ে ওঠে।	রোগভোগ অথবা ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে গড়ে ওঠে।
৪। অনাক্রম্যতা সৃষ্টি	বহিরাগত বস্তু বা জীবাণু বা অ্যান্টিজেন প্রবেশের মাধ্যমে এ অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয় না।	বিজাতীয় বস্তু বা জীবাণু বা অ্যান্টিজেন প্রবেশের ফলে এ অনাক্রম্যতা সৃষ্টি হয়।

CamScanner

পার্থক্যের বিষয়	সহজাত অনাক্রম্যতা	অর্জিত অনাক্রম্যতা
৫। অনাক্রম্যতার ধরন	এটি দেহের সাধারণ প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা নির্দিষ্ট কোনো রোগ সৃষ্টিকারী বস্তুর বিরুদ্ধে কাজ করে না।	এটি নির্দিষ্ট রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যেমন– পোলিও, হাম, গুটিবসন্ত ইত্যাদি।
৬। অনাক্রম্যতাজনিত স্মৃতি	থাকে না।	থাকে।
৭। সাড়াদানের সময়কাল	বহিরাগত বস্তু বা জীবাণু প্রবেশের কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।	বহিরাগত বস্তু বা জীবাণু বা অ্যান্টিবডি পাওয়ার কয়েক দিন (৫-১৪ দিন) পর।
৮। অনাক্রম্যতার স্থায়ীকাল	সারাজীবন।	কয়েকদিন থেকে সারাজীবন।
৯। কোষীয় উপাদান	ফ্যাগোসাইটস (ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল), কিলার কোষ, ডেনড্রাইটিক কোষ প্রভৃতি।	T-লিম্ফোসাইট এবং B-লিম্ফোসাইট।
১০। যাদের দেখা যায়	সব জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায়।	শুধু চোয়ালযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

সক্রিয় অনাক্রম্যতা ও নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতার মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	সক্রিয় অনাক্রম্যতা	নিষ্ক্রিয় অনাক্রম্যতা
১। উৎস	এটি ব্যক্তির দেহে সরাসরি সক্রিয়ভাবে উৎপন্ন হয়।	এই প্রকার অনাক্রম্যতা দেহের বাইরে থেকে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উৎপন্ন হয়।
২। প্রভাব	এই ধরনের অনাক্রম্যতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।	এই ধরনের অনাক্রম্যতার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।
৩। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া	নেই।	প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।
৪। উপশমের কাল	দীর্ঘ সময় পর (অ্যান্টিবডি উৎপাদনের মাধ্যমে)।	দ্রুত।

❑ কাজ : (i) সহজাত প্রতিরক্ষা এবং অর্জিত প্রতিরক্ষার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। (ii) সহজাত প্রতিরক্ষা এবং অর্জিত প্রতিরক্ষার ভিন্নতা তুলে ধরো।

১০.৫ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা
(Role of Antibody in Defence Mechanism or Immunity)

অ্যান্টিবডি (Antibody)

অ্যান্টিবডি (Antibody; GK. *Anti = against, body = body*) অ্যান্টিজেনের বিপরীত বস্তু অর্থাৎ *self* বা নিজস্ব বস্তু। অ্যান্টিবডি প্রধানত অ্যান্টিজেনের সাড়ায় দেহের B-লিম্ফোসাইট থেকে উৎপাদিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। এরা রক্তের প্লাজমা ও কলারসে বর্তমান থাকে। এরা অ্যান্টিজেনের সাথে যুক্ত (combine) হতে পারে এবং ক্লোনাল নির্বাচন (clonal selection) দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং দেহের প্রধান সৈনিক বা রক্ষণাবেক্ষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। অ্যান্টিবডিগুলো অনুপ্রবেশকারী বা বহিরাগত অ্যান্টিজেনকে ভক্ষণ করে, কখনো বিনষ্ট করে, কখনো মেরে ফেলে, কখনো বাইরে নিক্ষেপ করে। অ্যান্টিজেন হচ্ছে non-self এবং অ্যান্টিবডি হচ্ছে self বস্তু।

অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে যে প্রোটিনধর্মী বস্তু সংশ্লেষিত হয়ে উক্ত অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাণিদেহে অনাক্রম্যতা গড়ে তোলে তাকে অ্যান্টিবডি (Antibody) বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobulin) বলে।

দেহের সব অ্যান্টিবডিই গামা-গ্লোবিউলিন (γ-globulin) নামে পরিচিত। আর যেহেতু অ্যান্টিবডিসমূহ দেহের সুরক্ষার (immunity) কাজ করে তাই এদেরকে ইমিউনোগ্লোবিউলিন (Immunoglobulin, সংক্ষেপে– Ig) বলা হয়। এদের আণবিক ওজন ১,৫০,০০০-৯,০০,০০০ ডাল্টনের মধ্যে সীমিত। প্লাজমা প্রোটিনের প্রায় ২০% ইমিউনোগ্লোবিউলিন। মানুষের দেহে প্রায় ১০ কোটি (১০০ মিলিয়ন) ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে।

CamScanner

অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিউলিনের গঠন (Structure of Antibody or Immunoglobulin)

সকল প্রকার অ্যান্টিবডির একটি সাধারণ গঠন লক্ষ করা যায়। যেমন–

১। **হালকা চেইন ও ভারী চেইন** (Light and Heavy chains) : প্রতিটি অ্যান্টিবডি প্রধানত চারটি পলিপেপটাইড চেইন দ্বারা গঠিত। এদের মধ্যে দুটো দৈর্ঘ্যে ছোট (যাদের প্রতিটিতে প্রায় ২০০-২২০টি অ্যামিনো এসিড থাকে) ও অপর দুটি আকারে বড় (যাদের প্রতিটিতে প্রায় ৪০০-৪৫০টি অ্যামিনো এসিড থাকে)। ছোট পলিপেপটাইড চেইন দুটিকে **হালকা চেইন** ও বড় পলিপেপটাইড চেইন দুটিকে **ভারী চেইন** নামে অভিহিত করা হয়। হালকা ও ভারী চেইনের আণবিক ওজন যথাক্রমে 23 kD ও 50-70 kD (kiloDaltons)।

কোনো কোনো অ্যান্টিবডির চারটির বেশি পলিপেপটাইড শৃঙ্খলও থাকতে পারে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভারী চেইনের প্রান্তে একটি হালকা চেইন সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এবং এভাবে প্রান্তদেশে অন্তত দুটি হালকা ও ভারী উভয় ধরনের জোড়া তৈরি হয়।

২। **ডাইসালফাইড বন্ধন** (Disulfide bonds) : প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে অন্তত ৩টি আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন্ধন রয়েছে। পলিপেপটাইড চেইন বা শৃঙ্খলগুলো পরস্পরের সাথে ডাইসালফাইড বন্ধন (s – s) দ্বারা যুক্ত হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে Y-আকৃতির অ্যান্টিবডি গঠন সৃষ্টি করে। কখনো কখনো এই আকৃতি T-এর মতোও দেখা যায়।

৩। **স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল অংশ** (Constant and Variable regions) : প্রতিটি ভারী চেইন ও হালকা চেইনের দুটি অংশ থাকে– একটি **অপরিবর্তনশীল অংশ** বা স্থায়ী অংশ এবং অপরটি **পরিবর্তনশীল অংশ**। পরিবর্তনশীল অংশ প্রতিটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডির ক্ষেত্রে আলাদা হয় এবং এ অংশেই অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অ্যান্টিবডির সংযুক্তি ঘটে। অ্যান্টিজেন (জীবাণু) ধরার এ অংশটির নাম **প্যারাটপ** (paratope)। এটি তালা-চাবি (lock and key) পদ্ধতিতে কাজ করে। এক্ষেত্রে চাবি হচ্ছে প্যারাটপ, আর তালা অ্যান্টিজেন (জীবাণু)।

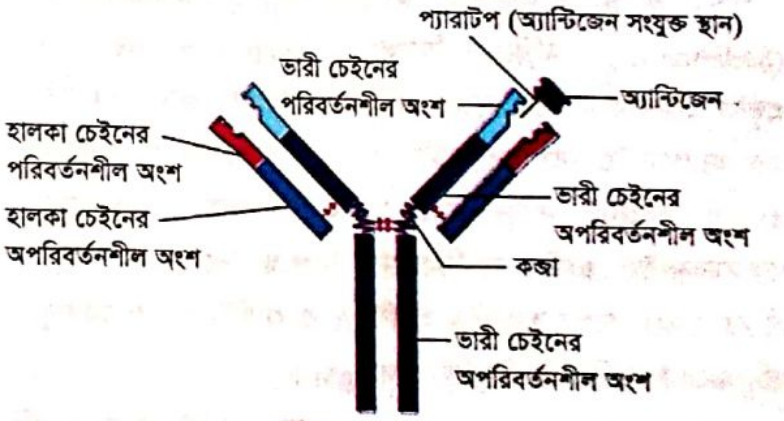

চিত্র ১০.১০ : একটি আদর্শ অ্যান্টিবডির (IgG) গঠন

যেহেতু অধিকাংশ অ্যান্টিবডির অ্যান্টিজেনকে আবদ্ধ করার জন্য দুটি পরিবর্তনশীল অংশ আছে তাই তাদের **বাইভ্যালেন্ট** (bivalent) বলে। প্যারাটপে অ্যামিনো এসিডের **দৈবচয়িত সন্নিবেশন** (random arrangement) বা **VDJ** (variable diversity joining) রিকম্বিনেশনের ফলে মানবদেহে অসংখ্য (প্রায় ১০ কোটি) অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হতে পারে।

৪। **কব্জা অঞ্চল** (Hinge region) : Y-আকৃতি বিশিষ্ট অ্যান্টিবডির প্রতিটি ভারী চেইনের একটি নমনীয় কব্জা অঞ্চল রয়েছে। এ অঞ্চল থেকেই অ্যান্টিবডির প্রতিটি বাহু দু'ভাগ হয়। বাহুদুটির দু'প্রান্তে অবস্থিত একটি করে মোট দুটি প্যারাটপে দুটি অ্যান্টিজেন আটক করা যায়। কব্জা অঞ্চলের নমনীয়তার জন্য অ্যান্টিবডি প্রয়োজন মতো আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে।

Y-আকৃতি বিশিষ্ট অ্যান্টিবডি অণুর দীর্ঘ দণ্ডবৎ অংশটি কেবল ভারী চেইনের অপরিবর্তনশীল অংশ দ্বারা গঠিত ও এই অংশটি কেলাসিত হতে পারে। অপরিবর্তনশীল অংশ অ্যান্টিবডির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের নির্ণায়ক এবং কোষ ও কলা তথা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে সংযুক্তির সহায়ক। একটি আদর্শ অ্যান্টিবডি (IgG) মনোমার প্রকৃতির।

CamScanner

বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবডি (Different Type of Antibody)

(ক) ভারী চেইনের স্থায়ী অঞ্চলের অ্যামিনো এসিডের সজ্জারীতির পার্থক্যের ভিত্তিতে মানবদেহের রক্তে পাঁচ রকমের ইমিউনোগ্লোবিউলিন অর্থাৎ অ্যান্টিবডি দেখা যায়, যথা– IgG, IgA, IgM, IgD ও IgE। এগুলো মানবদেহের প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাঁচ প্রকার অ্যান্টিবডির মধ্যে IgG রক্তরসে সর্বাধিক মাত্রায় থাকে এবং IgD ও IgE সবচেয়ে কম পরিমাণে থাকে। পাঁচ প্রকার অন্টিবডিতে উপস্থিত ভারী শৃঙ্খল বা চেইনগুলো হলো– IgG-γ (gamma) chain, IgA-α (alpha) chain, IgM-μ (mu) chain, IgD-δ (delta) chain ও IgE-ε (epsilon) chain.

(a) IgG (Immunoglobulin-G) : এ ধরনের অ্যান্টিবডি রক্তেই বেশি থাকে, তবে লসিকা ও অন্ত্রেও পাওয়া যায়। মানুষের রক্তের সব ধরনের অ্যান্টিবডির প্রায় ৭৫-৮০% IgG। এরা **মনোমার** হিসেবে থাকে। এর চারটি প্রকারভেদ আছে, যথা– IgG_1, IgG_2, IgG_3 ও IgG_4। এরা সহজেই **অমরাকে** (placenta) অতিক্রম করতে পারে, ফলে মায়ের রক্ত থেকে ভ্রূণের রক্তে স্থানান্তরিত হয়। এই কারণে একে **ম্যাটারনাল অ্যান্টিবডিও** (maternal antibody) বলে।

কাজ : ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে **অপসোনাইজেশন** (opsonisation) মাধ্যমে ধ্বংস করে। এগুলো বিষাক্ত পদার্থ (toxin) **প্রশমনেও** কাজ করে এবং **অনুপূরকতন্ত্রকে** (complement system) উদ্দীপিত করে দেহকে সুরক্ষিত রাখে।

(b) IgM (Immunoglobulin-M) : এরা সবচেয়ে বড় আকারের অ্যান্টিবডি এবং ভ্রূণের দেহে প্রথম সংশ্লেষিত হয়। রক্তে এরা **পেন্টামার** হিসেবে থাকে। এছাড়া এরা লসিকা এবং B-লিম্ফোসাইটের উপরিতলে অবস্থান করে। রক্তরসে এদের পরিমাণ প্রায় ৫-১০%। এর ২টি প্রকারভেদ আছে, যেমন– IgM_1 ও IgM_2।

কাজ : এ ধরনের **অ্যান্টিবডি অ্যাগ্লুটিনেশন, ব্যাকটেরিওলাইসিস** (bacteriolysis), **কমপ্লিমেন্ট ফিক্সেশন** (complement fixation) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করে। এমনকি এরা ফ্যাগোসাইটোসিস ত্বরান্বিত করে এবং সব ধরনের অ্যান্টিবডির তুলনায় পরজীবী দমনে এরা অধিক কার্যকরী। অণুজীবের পলিস্যাকারাইড জাতীয় অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে বিশেষ কার্যকরী। রক্তের ABO-গ্রুপের স্বাভাবিক অ্যান্টি-A ও অ্যান্টি-B এবং জীবাণু প্রতিরোধে সংশ্লেষিত অ্যান্টিবডি হলো IgM।

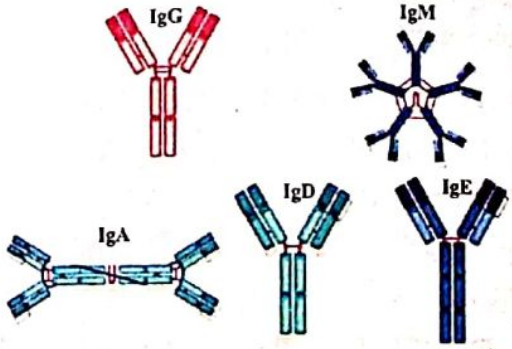

চিত্র ১০.১১ : বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিবডি

(c) IgA (Immunoglobulin-A) : এ ধরনের অ্যান্টিবডি রক্তে বেশি থাকে। এ ছাড়া ঘাম, অশ্রু, লালা ইত্যাদিতেও এদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। এরা **মনোমার** ও **ডাইমার** হিসেবে থাকে। অ্যান্টিবডির প্রায় ১০-১৫% এই প্রকার। মিউকাস স্তরে এর ক্ষরণ ঘটে। সব ক্ষরিত দেহতরলে এটি থাকে। তাই একে **ক্ষরণকারী অ্যান্টিবডি** (secretory antibody) বলে। এর ২টি প্রকারভেদ আছে, যেমন– IgA_1 ও IgA_2। মায়েদের বুকের দুধে IgA পাওয়া যায়। শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় এটি শিশুর দেহে স্থানান্তরিত হয়। অন্ত্রে ও মলে যে IgA পাওয়া যায় তাকে **ক্যাপ্রোঅ্যান্টিবডি** (coproantibody) বলে।

কাজ : মিউকাস স্তরে ক্ষরিত IgA দেহের অনাবৃত তলকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং জীবাণুকে পোষক দেহে প্রবেশে বাধা দেয়।

(d) IgD (Immunoglobulin-D) : রক্তে এ জাতীয় অ্যান্টিবডি খুব কম পরিমাণে (০.২%) থাকে। এরা **মনোমার** হিসেবে B-লিম্ফোসাইটের উপরিতলে সংলগ্ন থাকে। রক্ত, লসিকা ও লিম্ফোসাইট B কোষে এ I_gD পাওয়া যায়।

কাজ : এরা **B-লিম্ফোসাইটের অ্যান্টিজেন গ্রাহক** হিসেবে কাজ করে এবং B-লিম্ফোসাইটকে অ্যান্টিবডি প্রস্তুতিতে উদ্বুদ্ধ করে। এরা সম্ভবত B-লিম্ফোসাইটের পরিণতির শেষ দশাকেও উদ্দীপিত করে।

CamScanner

(e) IgE (Immunoglobulin-E) : রক্তরসে বেশ অল্প পরিমাণে (০.১%) থাকে। এরা মনোমার অবস্থায় মাস্ট কোষ ও বেসোফিল শ্বেতকণিকার পর্দার ওপর সংলগ্ন থাকে।

কাজ : মাস্ট কোষ বা বেসোফিল হতে **হিস্টামিন** ক্ষরণ ত্বরান্বিত করে। কৃমিজাতীয় পরজীবী নিষ্কাশনে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জির হাত থেকে দেহকে রক্ষা করে।

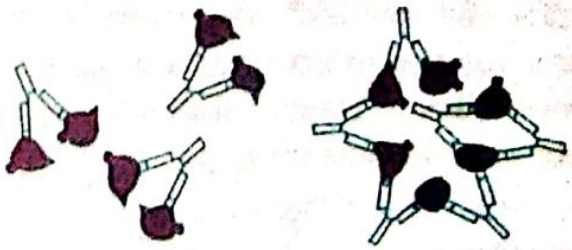

ক খ

চিত্র ১০.১২ : ক. মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি; খ. পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি

(খ) উৎপত্তিগতভাবে- অ্যান্টিবডি দু'প্রকারের হয়। যথা–

(a) মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি (Monoclonal antibodies) : যেসব অ্যান্টিবডি এক প্রকার প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন হয়, তাদের **মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি** বলে।

(b) পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি (Polyclonal antibodies) : যেসব অ্যান্টিবডি বহু প্রকার প্লাজমা কোষ থেকে উৎপন্ন হয়, তাদের **পলিক্লোনাল অ্যান্টিবডি** বলে।

অ্যান্টিবডির কার্যপদ্ধতি (Function of Antibody or Immunoglobulin)

অ্যান্টিবডির প্রতিরক্ষা অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। একটি অ্যান্টিবডি একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন বা নির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধেই শুধুমাত্র কাজ করে থাকে।

একটি অ্যান্টিবডি (অ্যাগ্লুটিনিন) অনেক সময় একই সঙ্গে দুটি বা তারও বেশি অ্যান্টিজেন (অ্যাগ্লুটিনোজেন) বা অন্য কোনো বহিরাগত জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে আবদ্ধ হতে পারে। তবে অ্যান্টিবডি যখন কোনো অ্যান্টিজেনকে আবদ্ধ করে, সেই অ্যান্টিজেনকে সরাসরি ধ্বংস করতে পারে না। অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিজেনকে ধ্বংস করার জন্য নিম্নলিখিত কতগুলো কার্যকরী পদ্ধতিকে (effector mechanisms) উদ্দীপিত করে, যাতে নির্দিষ্টভাবে অ্যান্টিজেনগুলো নিষ্ক্রিয় হতে পারে।

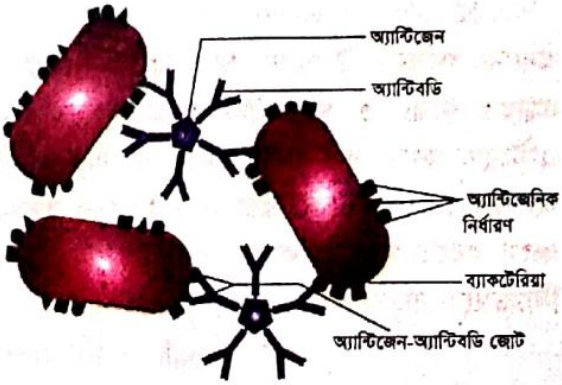

চিত্র ১০.১৩ : অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া (অ্যাগ্লুটিনেশন)

অ্যান্টিবডি নিম্নলিখিত যেকোনো একটি পদ্ধতির সাহায্যে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু বা তার প্রতিবিষকে (অ্যান্টিজেন) নিষ্ক্রিয় করতে পারে।

১। দলবদ্ধকরণ বা অ্যাগ্লুটিনেশন (Agglutination) : এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি একাধিক অ্যান্টিজেনসম্পন্ন জীবাণুর অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে তাদের দলবদ্ধ করে। এই প্রক্রিয়াটি **অ্যাগ্লুটিনেশন**। যে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন যুক্ত কোষগুলোকে দানা বাঁধতে সাহায্য করে তাদের **অ্যাগ্লুটিনিন** (agglutinin) বলে। মূলত IgM ও IgG অ্যান্টিবডি এ কাজের সাথে যুক্ত।

২। অধঃক্ষেপণ বা প্রেসিপিটেশন (Precipitation) : এক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ অধঃক্ষিপ্ত হয়। যে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনকে অধঃক্ষিপ্ত করে, তাকে **প্রেসিপিটিন** (precipitine) বলে। মূলত IgA ও IgM অ্যান্টিবডি এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩। অপসোনাইজেশন (Opsonization) : অ্যাগ্লুটিনেশনের মাধ্যমে অ্যান্টিবডি অণুজীবগুলোর ফ্যাগোসাইটোসিসকে আরও ত্বরান্বিত করে। ফ্যাগোসাইটিক কোষের নিকট ফ্যাগোসাইটোসিসের জন্য অণুজীবগুলোকে অ্যান্টিবডি যেভাবে সমর্থ বা যোগ্য করে তোলে তাকে **অপসোনাইজেশন** বলে। এসব অ্যান্টিবডিকে **অপসোনিন** (opsonin) বলে। মূলত IgG ও IgM অ্যান্টিবডি এ কাজের সাথে যুক্ত থাকে।

CamScanner

৪। **কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের সক্রিয়করণ** (Activation of complement system) : প্রায় ২০ ধরনের প্লাজমা প্রোটিনে গঠিত এমন একটি আন্তঃসম্পর্কিত গ্রুপ যা নিষ্ক্রিয়ভাবে রক্তে সংবহিত হয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সাহায্য করে তাকে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বা কমপ্লিমেন্ট বলে। অ্যান্টিবডি IgG ও IgM কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের বেশ প্রভাবশালী উদ্বুদ্ধক। কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম উদ্বুদ্ধ হলে উহার প্রোটিন উপাদানসমূহ সংক্রামক জীবাণুকে ধ্বংস অথবা নিষ্ক্রিয় করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৫। **প্রশমন বা নিউট্রালাইজেশন** (Neutralization) : যে প্রক্রিয়ায় একটি অ্যান্টিবডি কোনো অ্যান্টিজেনের ক্ষতিকর অংশগুলোকে ঢেকে রেখে ক্ষতিকর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে বাধা দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেয় কিংবা অ্যান্টিজেন ক্ষরিত টক্সিনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে তার বিষক্রিয়া থেকে অন্যান্য দেহকোষকে রক্ষা করে তাকে প্রশমন বলে। এক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনধর্মী জীবাণুর দেহনিঃসৃত অধিবিষ বা টক্সিন (toxin)-কে আবৃত ও প্রশমিত করে এবং নিষ্ক্রিয় করে। এ প্রকার অ্যান্টিবডিকে প্রতিবিষ বা অ্যান্টিটক্সিন (antitoxin) বলে। IgG ব্যাকটেরিয়াজাত টক্সিন প্রশমনে বিশেষ উপযোগী।

৬। **বিশ্লিষ্টকরণ বা লাইসিস** (Lysis) : এক্ষেত্রে কিছু শক্তিশালী অ্যান্টিবডি সরাসরি বহিরাগত জীবাণুর ঝিল্লিকে আক্রমণ করে এবং তাকে ছিন্ন করে ফেলে। এ প্রকার অ্যান্টিবডিকে বিশ্লিষ্টকরণ বলে। অনেক সময় IgM অ্যান্টিবডি এ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

সংক্ষেপে অ্যান্টিবডির প্রধান কাজ (Major Functions of Antibodies) : (১) দেহে অনুপ্রবেশকৃত ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান নষ্ট করতে সহায়তা করে; (২) ব্যাকটেরিয়া নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্ক্রিয় করতে সহায়তা করে; (৩) গর্ভকালীন সময়ে অ্যান্টিবডি মায়ের শরীর থেকে বাচ্চার শরীরে প্রবেশ করে বাচ্চার দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; (৪) কিছু কিছু অ্যান্টিবডি সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; (৫) কিছু অ্যান্টিবডি দেহে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের অনুপ্রবেশে বাধা দান করে; (৬) অনেক অ্যান্টিবডি আছে যেগুলো কৃমি ধ্বংস করতে সহায়তা করে; (৭) অপসোনাইজেশনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং (৮) এরা কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমকে সক্রিয় করে।

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির আন্তঃক্রিয়া (Antigen-Antibody Interaction)

অ্যান্টিবডি বিভিন্ন পদ্ধতিতে অ্যান্টিজেনদের ধ্বংস করে এদের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে দেহকে রক্ষা করে। যেমন– প্রশমন, দলবদ্ধকরণ, অধঃক্ষেপণ, বিশ্লিষ্টকরণ, অপসোনাইজেশন ইত্যাদি।

বহিরাগত কোনো জীবাণু বা অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশ করলে দেহে প্রোটিনধর্মী বস্তু অ্যান্টিবডি গঠিত হয়। এরপর অ্যান্টিবডির নির্দিষ্ট অংশে (অ্যান্টিজেন আবদ্ধকারী অংশ) অ্যান্টিজেন যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি যৌগ (antigen-antibody complex) গঠিত হয়। এটিই **অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়া** (Antigen- antibody interaction) অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে দেহের মধ্যে অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেনের রাসায়নিক সংযুক্তির মাধ্যমে অদ্রবণীয় জটিল যৌগ গঠিত হয় তাকে **অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়া** বলে।

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি আন্তঃক্রিয়ার ধাপ (Steps of Antigen- Antibody interaction)

১. অ্যান্টিবডি গঠন : নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে দেহে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি গঠিত হয়।

২. অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগ গঠন : অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি কাছাকাছি এলে এদের মধ্যে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগ (Ag-Ab complex) গঠিত হয়। অ্যান্টিবডির অ্যান্টিজেন আবদ্ধকারী অংশে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন সংযুক্ত হয়।

৩. অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিজেন নিঃসৃত টক্সিন পদার্থের নিষ্ক্রিয়করণ : দলবদ্ধকরণ (agglutination), অধঃক্ষেপণ (precipitation), অপসোনাইজেশন (opsonization), কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের সক্রিয়করণ (activation of complement system), প্রশমন (neutralization), বিশ্লিষ্টকরণ (lysis) প্রভৃতি কয়েকটি পদ্ধতিতে অ্যান্টিবডির দ্বারা পোষকদেহে অ্যান্টিজেন তথা অ্যান্টিজেন নিঃসৃত টক্সিক জাতীয় বস্তুকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

CamScanner

জীবাণু বা অ্যান্টিজেন ধ্বংসের প্রক্রিয়া : দুটি বিশেষ পদ্ধতিতে জীবাণু তথা অ্যান্টিজেন ধ্বংস হয়, সেগুলো হলো– ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) ও ডায়াপেডেসিস (diapedesis)।

১. **ফ্যাগোসাইটোসিস (Phagocytosis) :** এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শ্বেতকণিকা (মনোসাইট, নিউট্রোফিল), ম্যাক্রোফাজ ইত্যাদি জীবাণুদের আত্মসাৎ করে। যখন কোনো জীবাণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ফ্যাগোসাইটিক কোষগুলো ক্ষণপদ বিস্তার করে জীবাণুকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে **ফ্যাগোজোম** (phagosome) গঠন করে। ফ্যাগোজোম নিঃসৃত এনজাইমের সাহায্যে জীবাণু পাচিত হয়ে যায়।

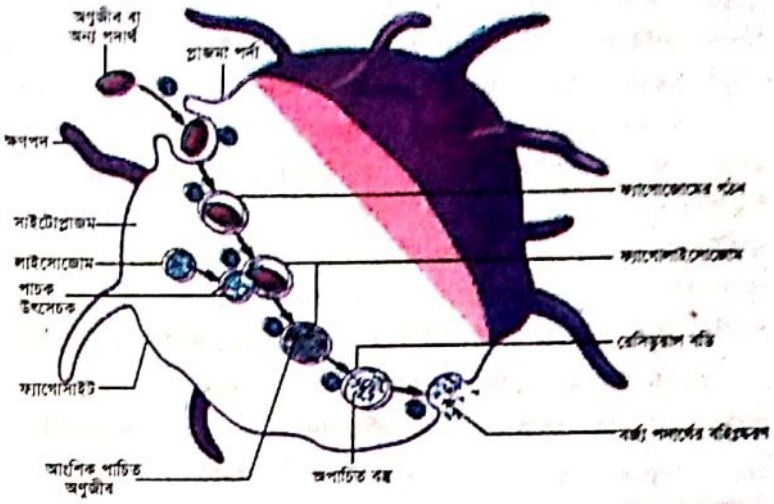

চিত্র ১০.১৪: ফ্যাগোসাইটোসিস

২. **ডায়াপেডেসিস (Diapedesis) :** এই প্রক্রিয়ায় দেহের কোনো স্থান জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে সেই স্থানের শ্বেত রক্তকণিকাগুলো, বিশেষ করে মনোসাইট ও নিউট্রোফিল রক্তবাহের প্রাচীর ভেদ করে আক্রান্ত স্থানে জড়ো হয় এবং জীবাণুগুলোকে ঘিরে ফেলে এবং ধ্বংস করে।

শ্বেত রক্তকণিকাগুলো রক্তজালকের এন্ডোথেলিয়াম কোষস্তরের কোনো সংযোগস্থলের মধ্য দিয়ে একটি ক্ষণপদ প্রবেশ করায় এবং সমগ্র শ্বেত রক্তকণিকাটি বেরিয়ে আসে।

এই পথে অন্যান্য শ্বেত রক্তকণিকাগুলো বেরিয়ে এসে জীবাণুদের ক্ষণপদ বেষ্টন করে ঘিরে ফেলে এবং এনজাইমের ক্রিয়ায় জীবাণুদের ধ্বংস করে। এই প্রক্রিয়াটিই ডায়াপেডেসিস অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় দেহের কোনো আক্রান্ত স্থানের রক্তজালকের প্রাচীর ভেদ করে শ্বেত রক্তকণিকাগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে এবং বহিরাগত জীবাণুদের ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ধ্বংস করে তাকে ডায়াপেডেসিস বলে। এভাবেই অ্যান্টিবডির দ্বারা অ্যান্টিজেন বা বহিরাগত জীবাণুর হাত থেকে পোষক কোষ তথা পোষকদেহ রক্ষা পায়। অনাক্রম্য সাড়া দিতে পারে এমন প্রাণিদেহে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করালে রক্তে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হতে ৩-৪ দিন সময় লাগে।

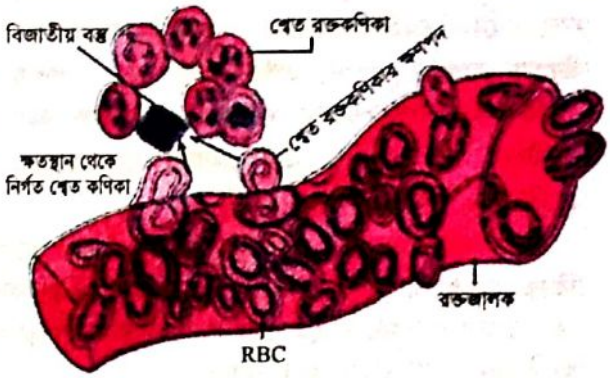

চিত্র ১০.১৫ : ডায়াপেডেসিস

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়াজনিত সমস্যা (Reaction problems of Antigen and Antibody)

১। এইডস (AIDS) এর কারণে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া সংঘটিত হয় না।

২। দেহ কখনো কখনো নিজের দেহকোষের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে। তখন অটোইমিউন রোগ (autoimmune diseases, যেমন– ডায়াবেটিস মেলিটাস) সৃষ্টি হয়।

৩। দেহে অনেকসময় অ্যান্টিজেন নয় এমন বস্তুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপাদন করে। তখন অ্যালার্জি (allergies) দেখা দেয়। এক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ হিস্টামিন (histamine) জাতীয় অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়।

❑ **কাজ :** (i) অ্যান্টিবডির চিত্রসহ গঠন বর্ণনা কর। (ii) দেহের লাল তরলের Y আকৃতির রোগ প্রতিরোধী উপাদানের কার্যপদ্ধতি বিশ্লেষণ কর।/অ্যান্টিবডি মানবদেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় – কীভাবে ভূমিকা পালন করে? বিশ্লেষণ কর।/দেহ প্রতিরক্ষায় অ্যান্টিবডি কিভাবে অণুজীব ধ্বংস করে– তা বিশ্লেষণ কর।/অ্যান্টিবডি কীভাবে অণুজীবের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল হয়– ব্যাখ্যা কর।/'প্রোটিন জাতীয় পদার্থ' জীবাণু ধ্বংসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কীভাবে?

[প্রাসঙ্গিক তথ্য : অ্যান্টিজেন (Antigen)

অ্যান্টিজেন (Antigen, GK. *Anti = against, genos = birth*) শব্দটি Antibody generating এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অ্যান্টিজেন হচ্ছে যেকোনো বিজাতীয় প্রোটিন বা পলিস্যাকারাইড, যা প্রাণিদেহে থাকে না। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা এদের নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ অথবা অন্যদেহের প্রতিটি কোষে যে প্রোটিন রয়েছে তা নির্দিষ্ট প্রাণিদেহের জন্য অপরিচিত এবং এটিই অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে। একটি অ্যান্টিজেন প্রাণিদেহকে একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদনে উদ্দীপ্ত করে। **যেসব বিজাতীয় জীবাণু বা অধিবিষ দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বা ইমিউনোজেন (immunogen) বলে।** হাঙ্গেরিয় অণুজীব বিজ্ঞানী **Ladislas Deutsch** (1903) সর্বপ্রথম অ্যান্টিজেন শব্দটি ব্যবহার করেন।

অ্যান্টিজেনকে non-self body বা অনুপ্রবিষ্ট সংক্রমণকারী বলে, যা দেহের নয়, যেমন– ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, টিউমার, ক্যান্সার, সংক্রামক জীবাণু প্রভৃতি। অ্যান্টিজেনের বিশেষায়িত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে **'অনাক্রম্যতার ইমিউনো সাড়া (immunogenicity) সৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে হবে এবং এরা অবশ্যই *non-self* বা বহিরাগত বস্তু হবে'।** অধিকাংশ অ্যান্টিজেন প্রোটিনধর্মী ও জটিল গঠনবিশিষ্ট। এদের আণবিক ওজন সাধারণত ১০,০০০ ডাল্টনের অধিক। তবে অ্যান্টিজেন জটিল শর্করা অর্থাৎ বৃহদাকার পলিস্যাকারাইড বা বৃহদাকার লাইপোপ্রোটিন বা মিউকোপলিস্যাকারাইড বা গ্লাইকোপ্রোটিন বা নিউক্লিওপ্রোটিনও হতে পারে। অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডির সঙ্গে সংযুক্ত বা আবদ্ধ হতে পারে।

অ্যান্টিজেনধর্মী জটিল প্রোটিনের যে অংশ অ্যান্টিবডির সঙ্গে সংযুক্ত হয় তাকে **এপিটোপ** (epitope; epi = upon, topos = place) বা **অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিন্যান্ট** (antigenic determinant) বা **নির্ধারক** বলে। কোনো কোনো অ্যান্টিজেনধর্মী প্রোটিনের বা একটি অ্যান্টিজেনের একাধিক এপিটোপ থাকতে পারে। কখনো কখনো বিশেষ ক্ষুদ্র রাসায়নিক অণু (যেমন– নানা ধরনের ওষুধ, ধুলোবালির রাসায়নিক উপাদান, নানা ধরনের শিল্পজাত রাসায়নিক পদার্থ, ত্বকের শুকনো আঁশের অপজাত পদার্থ, প্রাণীর খুশকিজাত পদার্থ প্রভৃতি) নিজে অ্যান্টিজেন না হলেও কোনো বৃহৎ প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেনধর্মী হয়ে পড়ে ও অ্যান্টিবডির সঙ্গে আবদ্ধ হয়।

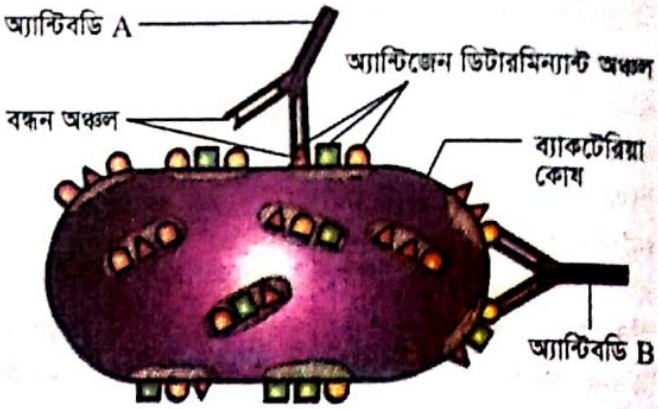

চিত্র ১০.১৬ : ব্যাকটেরিয়া (অ্যান্টিজেন) কোষের অ্যান্টিজেনিক নির্ধারক অঞ্চলে অ্যান্টিবডির বন্ধন।

এমন পদার্থকে বলা হয় **হ্যাপ্টেন** (hapten)। হ্যাপ্টেনগুলো বিশেষ প্রোটিনের ওপর এপিটোপ হিসেবে কাজ করে। [বিঃদ্রঃ রক্ত গ্রুপের (blood group) ক্ষেত্রে, লোহিত রক্তকণিকার আবরণীতে বিদ্যমান বংশগতভাবে উৎপন্ন অ্যান্টিজেন পদার্থ, যা জেনেটিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ভ্রূণ অবস্থায় উৎপন্ন হয়ে আজীবন অপরিবর্তিত থাকে। মানুষের রক্তে প্রধান তিন ধরনের অ্যান্টিজেন থাকে, যথা– A, B ও Rh]

অ্যান্টিজেনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Antigen)

১। অ্যান্টিজেনের যে বিশেষ স্থানে অ্যান্টিবডি যুক্ত হয় তাকে **অ্যান্টিজেনিক নির্ধারক স্থান** (antigenic determinant site) অথবা **এপিটোপ** (epitope) বলে। এপিটোপে নির্দিষ্ট রাসায়নিক গ্রুপ থাকে যার সঙ্গে অ্যান্টিবডির **অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট** (antigen binding site) বা **প্যারাটোপ** (paratops) যুক্ত হয়।

২। অ্যান্টিজেন নির্ধারক স্থানগুলোকে অন্য কথায় **ভ্যালেন্স** (valence) বলে; বেশিরভাগ অ্যান্টিজেনের অনেকগুলো অ্যান্টিজেন নির্ধারক স্থান থাকে বলে এগুলোকে **মালটিভ্যালেন্ট** (multivallent) বলে।

৩। অ্যান্টিজেনের দুটি বিশেষ ক্ষমতা থাকে, যেমন– (i) **অনাক্রম্যতাকরণ** (immunogenecity)– নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদনের ক্ষমতা; ও (ii) **বিক্রিয়াকরণ** (reactivity)– উৎপন্ন অ্যান্টিবডির সঙ্গে অ্যান্টিজেনের বিক্রিয়া করার ক্ষমতা। যেসব অ্যান্টিজেনের এই দুটি ক্ষমতা থাকে তাদের **সম্পূর্ণ অ্যান্টিজেন** (complete antigen) বলে।

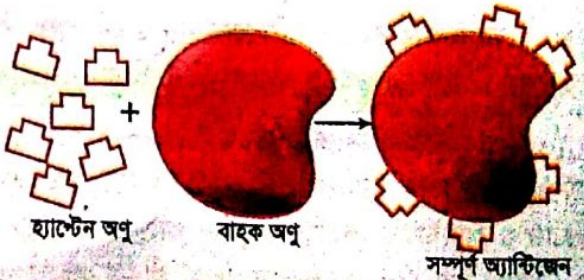

চিত্র ১০.১৭ : ক্ষুদ্র হ্যাপ্টেন অণু ও সম্পূর্ণ অ্যান্টিজেন গঠন

অ্যান্টিজেনের প্রকারভেদ (Types of Antigen) : অ্যান্টিজেন দু'রকমের হয়, যথা–

১। **এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন (Exogenous antigen) :** যেসব অ্যান্টিজেন প্রাণিদেহের বাইরে উৎপন্ন হয় তাদের এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে। যেমন– পরাগরেণু, দূষক পদার্থ, ভেষজ পদার্থ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ইত্যাদি।

২। **এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন (Enodogenous antigen) :** যেসব অ্যান্টিজেন প্রাণিদেহের ভেতরে উৎপন্ন হয় তাদের এন্ডোজেনাস অ্যান্টিজেন বলে। যেমন– ইঁদুর, বিড়াল, ভেড়া, ঘোড়া প্রভৃতির লোহিত কণিকায় অবস্থিত **ফরসম্যান অ্যান্টিজেন** (forssman antigen), স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত **কার্ডিওলিপিন** (cardiolipin) অ্যান্টিজেন এই রকমের অ্যান্টিজেন।

অ্যান্টিজেনের উদাহরণ (Example of Antigen):

সমগ্র অণুজীব (microbs), যেমন– ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে; আবার **অণুজীবের কয়েকটি উপাংশও** অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে। ব্যাকটেরিয়ার কোনো অংশ, যেমন– ফ্ল্যাজেলা, ক্যাপসিউল ও কোষপ্রাচীর অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ অ্যান্টিজেনধর্মী (antigenic)। **ব্যাকটেরিয়াঘটিত অধিবিষ** (bacterial toxins) তীব্র অ্যান্টিজেনধর্মী। অণুজীব ছাড়া অন্যান্য পদার্থ, যেমন– ডিমের সাদা অংশ, ফুলের রেণু, গ্রহণ-অযোগ্য রক্তকণিকা (incompatible blood cells), কলাকোষের এবং আন্তরযন্ত্রীয় অঙ্গের প্রতিস্থাপন (transplantation) ইত্যাদি অ্যান্টিজেনের উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।]

অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির মধ্যে পার্থক্য

অ্যান্টিজেন	অ্যান্টিবডি
১। অ্যান্টিজেন হলো দেহে অনুপ্রবিষ্টকারী বহিরাগত বস্তু বা প্যাথোজেন।	১। অ্যান্টিবডি হলো অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতে উৎপন্ন অ্যান্টিজেন প্রতিরোধী বস্তু।
২। রাসায়নিক প্রকৃতিতে এরা প্রোটিন, গ্লাইকোপ্রোটিন বা জটিল কার্বোহাইড্রেট জাতীয়। পরাগরেণু, ডিমের সাদা অংশ, রক্তকণিকা ইত্যাদিও প্রোটিন হিসেবে বিবেচিত হয়।	২। রাসায়নিক প্রকৃতিতে এরা সবসময় প্রোটিন জাতীয়।
৩। এরা সাধারণত লোহিত কণিকার প্লাজমামেমব্রেনের উপরিতলে বা জীবাণুর উপরিতলে বা দেহতরলে অবস্থান করে।	৩। এরা সাধারণত রক্তরস বা প্লাজমায় থাকে। এ ছাড়া দেহতরলে, নির্দিষ্ট প্লাজমামেমব্রেনে থাকে।
৪। অ্যান্টিজেনের প্রভাবে অ্যান্টিবডির সৃষ্টি হয়।	৪। অ্যান্টিবডির প্রভাবে অ্যান্টিজেন সৃষ্টি হয় না।
৫। এরা অনাক্রম্যতন্ত্রকে উদ্দীপিত করে।	৫। এরা দেহ প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে।
৬। এরা ধ্বংসাত্মক।	৬। এরা রক্ষণাত্মক।

অ্যান্টিবডি ও ইন্টারফেরনের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অ্যান্টিবডি	ইন্টারফেরন
১। কাজের প্রকৃতি	মন্থর।	দ্রুত।
২। কার বিরুদ্ধে	ব্যাকটেরীয় ও ভাইরাল সংক্রমণ।	ভাইরাল সংক্রমণ।
৩। কার্যকাল	দীর্ঘস্থায়ী।	স্বল্পস্থায়ী।
৪। ক্রিয়াস্থল	কোষের বাইরে।	কোষের ভেতর।

১০.৬ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার ভূমিকা

(Role of Vaccine in Defence mechanism/Immunity)

ভ্যাকসিন শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ভ্যাকসিনাস (vaccinus) থেকে এসেছে যার আক্ষরিক অর্থ হলো 'ফ্রম কাউ' (from cow) বা 'গরু থেকে প্রাপ্ত'। ইংরেজ চিকিৎসক ড. এডওয়ার্ড জেনার (Dr. Edward Janner, 1796) প্রথম গরুর পুঁজ বা রস (scab) থেকে গুটিবসন্তের (small pox) টিকা আবিষ্কার করেন। এর অনেক বছর পর ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) কলেরা (1879 সালে) রোগের এবং জলাতঙ্ক রোগের টিকা (1885 সালে, antirabies vaccine)

আবিষ্কার করেন। এমিল অ্যাডলফ ভন বেইরিং (Emil Adolf Von Behring) ডিপথেরিয়া ও টিটেনাস রোগের অনাক্রম্যতার টিকা আবিষ্কার করেন। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রোগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে ও টিকা প্রস্তুতিকরণ পদ্ধতির ক্রমোন্নতি ঘটেছে। টিকা বা ভ্যাকসিন (vaccine) হলো প্রাণিদেহে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের নিষ্ক্রিয় পরিস্রুত সাসপেনশন। টিকায় বিদ্যমান অণুজীবগুলো (ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া) জীবিত, অর্ধমৃত বা মৃত হতে পারে। অর্থাৎ কোনো রোগ-প্রতিরোধের উদ্দেশ্য কোনো রোগজীবাণু থেকে প্রস্তুত যে উপাদান মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে সেই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জন্মায় তাকে অথবা, নিষ্ক্রিয় জীবাণুমাত্রা দেহে প্রবেশ করিয়ে যে অনাক্রম্যতা জাগানো হয় তাকে ভ্যাকসিন (vaccine) বা টিকা বলে ।

Dr. Edward Jenner
(1749-1823)

Louis Pasteur
(1822-1895)

সাধারণত কোনো রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব দিয়েই ওই রোগের টিকা তৈরি করা হয়। টিকা প্রবেশ করালে প্রাণিদেহে ওই একই জীবাণু বা নিকট সম্পর্কিত রোগজীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধক্ষম হয়ে ওঠে। দেহে টিকা দেওয়া মানে হলো ওই রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করানো। কিন্তু যেহেতু এ জীবাণুগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় থাকে সেহেতু এরা জীবদেহে কোনো রোগ সৃষ্টি না করে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে বর্তমানে পোলিও, টিটেনাস, হাম, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা, হুপিংকাশি, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের টিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু মরণব্যাধি এইডস (AIDS)-এর ভাইরাস HIV কিংবা হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসের প্রতিষেধক কোনো টিকা আজও আবিষ্কার হয়নি।

চিত্র ১০.১৮ : টিকা দান কর্মসূচি

একটি আদর্শ টিকার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a ideal vaccine) : (১) সারাজীবনের জন্য দেহকে অনাক্রম্য করে। (২) সুনির্দিষ্ট জীবাণু থেকে দেহকে সুরক্ষা দেয়। (৩) রোগের সংক্রমণ রোধ করে। (৪) খুব দ্রুত অনাক্রম্যতার সূচনা ঘটায়। (৫) মায়ের অনাক্রম্যতাকে সন্তানে পরিবাহিত করে। (৬) সুস্থিত, সস্তা এবং নিরাপদ।

টিকার প্রকারভেদ (Type of Vaccines)

মানবদেহের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে দমন করতে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের টিকা আবিষ্কার করেছেন। যেমন–

১। **জীবন্মৃত জীবন্ত বা শক্তি হ্রাস টিকা** (Attenuated live vaccine) : কালচার করা, ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল করে দেওয়া জীবিত জীবাণু নিয়ে তৈরি। উদাহরণ– হাম (মিজলজ), মাম্পস, পোলিও, জলাতঙ্ক, যক্ষ্মা, পানিবসন্ত (চিকেন পক্স), প্লেগ, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের ভ্যাকসিন।

২। **মৃত বা নিষ্ক্রিয় টিকা** (Killed or inactivated vaccine) : এ ধরনের টিকা মৃত জীবাণু দিয়ে তৈরি। উদাহরণ– ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, পোলিও, হেপাটাইটিস A, র‍্যাবিস প্রভৃতি ভ্যাকসিন।

৩। **বিষভিত্তিক বা টক্সোয়ড টিকা** (Toxoid vaccine) : এ ধরনের টিকা জীবাণু নিঃসৃত টক্সয়েড দিয়ে তৈরি। উদাহরণ– ডিপথেরিয়া, টিটেনাস (ধনুষ্টংকার) প্রভৃতি রোগের ভ্যাকসিন।

৪। উপএকক বা সাবইউনিট টিকা (Subunit vaccine) : অনেক ক্ষেত্রে সংক্রমণকারী জীবাণুর দেহতল থেকে রাসায়নিক উপাদান (নির্দিষ্ট প্রোটিনের অংশ) আলাদা করে ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। উদাহরণ– হেপাটাইটিস-B ভ্যাকসিন, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ভ্যাকসিন প্রভৃতি।

৫। অনুবন্ধী বা কনজুগেট টিকা (Conjugate vaccine) : এ ধরনের টিকা দুটি ভিন্ন ধরনের উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার আবরণের সাথে একটি বাহক প্রোটিন যুক্ত করা হয়। উদাহরণ–হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-B (Hib) ভ্যাকসিন, নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন প্রভৃতি।

৬। ডিএনএ টিকা (DNA vaccine) : রিকম্বিনেন্ট DNA পদ্ধতিতে DNA ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়।

*** জীবাণুঘটিত রোগের ভ্যাকসিন, তাদের জীবাণু ও প্রকৃতি

জীবাণুঘটিত রোগ	জীবাণুর ধরন	ভ্যাকসিনের প্রকৃতি
১। যক্ষ্মা (Tuberculosis)	ব্যাকটেরিয়া	BCG- শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত জীবাণু
২। টাইফয়েড (Typhoid)	ব্যাকটেরিয়া	টাইফয়েড ভ্যাকসিন-হ্রাসপ্রাপ্ত জীবাণু
৩। প্লেগ (Plage)	ব্যাকটেরিয়া	প্লেগ ভ্যাকসিন-হ্রাসপ্রাপ্ত জীবাণু
৪। পোলিও মায়েলেটিস (Polio)	ভাইরাস	পোলিও ভ্যাকসিন নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৫। হাম (Measles)	ভাইরাস	মিজলস্ ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৬। রুবেলা (Rubella)	ভাইরাস	রুবেলা ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৭। মাম্পস (Mamps)	ভাইরাস	মাম্পস ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৮। ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza)	ভাইরাস	ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
৯। পীতজ্বর (Yellow Fever)	ভাইরাস	পীতজ্বর ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
১০। জলাতঙ্ক (Rabbies)	ভাইরাস	জলাতঙ্ক ভ্যাকসিন- নিষ্ক্রিয় ভাইরাস
১১। ডিপথেরিয়া (Diptheria)	ব্যাকটেরিয়া	টক্সয়েড
১২। টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার (Tetanus)	ব্যাকটেরিয়া	টক্সয়েড
১৩। কলেরা (Cholera)	ব্যাকটেরিয়া	কলেরা ভ্যাকসিন-মৃত অণুজীব

টিকা তৈরির পদ্ধতি (Method of Vaccine Preparation) : রোগ প্রতিরোধকারী অণুজীবকে কোনো নির্ধারিত জীবকোষে কালচার করে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। কালচারকৃত এসব অণুজীবকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধন করে সংরক্ষণ করা হয়। এরপর অণুজীবগুলোকে বিশেষ পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় বা নিষ্প্রাণ করে টিকা তৈরি করা হয়। বিভিন্ন প্রকার টিকা বিভিন্ন উৎস থেকে তৈরি করা হয়। অনেক সময় জিন প্রকৌশল প্রক্রিয়ায় জিন ক্লোনিং করে অথবা জিন সংশ্লেষ করে টিকা তৈরি করা হয়। টাইফয়েড জ্বরের টিকা *Salmonella typhi* নামক ব্যাকটেরিয়ার মৃতকোষ দিয়ে তৈরি করা হয়। র‍্যাবিস রোগের টিকা *Rabies* ভাইরাসের অর্ধমৃত দেহ হতে তৈরি করা হয়। গুটি বসন্তের জীবাণু *Variola* ভাইরাসকে প্রতিরোধ করার জন্য *Vaccina* ভাইরাস নিয়ে তৈরি টিকা প্রদান করা হয়। আধুনিক জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে বর্তমানে পোলিও, টিটেনাস, হাম, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা, হুপিংকাশি, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস-B ইত্যাদি রোগের টিকা তৈরি করা হয়। ডিপথেরিয়ার টিকা জিন সংশ্লেষের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

টিকাকরণ বা ভ্যাক্সিনেশন (Vaccination) : অনাক্রম্যতা অর্জনের জন্য দেহের মধ্যে টিকা বা ভ্যাকসিন দেওয়ার পদ্ধতিকে টিকাকরণ বা ভ্যাক্সিনেশন বলে।

টিকাকরণের নীতি (Principles of Vaccination)

চিত্র ১০.১৯ : টিকাকরণ বা ভ্যাক্সিনেশন

রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের রোগ সৃষ্টির ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেহে প্রবেশ করিয়ে অনাক্রম্যতা গড়ে তোলা হয়। এই পদ্ধতিতে সক্রিয় অনাক্রম্যীকরণের মাধ্যমে **ইমিউনোলজিকাল মেমোরির** (immunological memory) সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে রোগ সংক্রামক জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলে দেহ দ্রুততার সঙ্গে প্রবিষ্ট জীবাণুকে ধ্বংস করে। প্রকৃতপক্ষে, দেহে প্রবিষ্ট ভ্যাকসিনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিজেন নির্দিষ্ট T ও B-লিম্ফোসাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং **মেমোরি সেল** (memory cell) উৎপন্ন হয়। ভ্যাকসিনেশন প্রধানত অণুজীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও বিভিন্ন অধিবিষ (toxins), যেমন– সাপের বিষ (snake venoum), মাকড়সার বিষ প্রভৃতির বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়। জীবাণু বা পরজীবীর আক্রমণে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে ভ্যাক্সিনেশন আর কোনো কাজে আসে না। এসব দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে ভ্যাক্সিনেশন কতগুলো নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা–

১। ভ্যাকসিন বা টিকা মৃত বা নির্জীব জীবাণু অথবা তাদের নিষ্ক্রিয় উপজাত সমন্বয়ে গঠিত।

২। নির্জীব জীবাণু ভ্যাকসিন হিসেবে শরীরে প্রবেশ করানো হলে এটি বংশবৃদ্ধি করলেও কোনো রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। নিষ্ক্রিয় টক্সয়েড টিকা হিসেবে ব্যবহৃত হলে এটি শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

৩। ভ্যাকসিন প্রয়োগে যে অনাক্রম্যতা জাগে তা জীবনব্যাপী স্থায়িত্ব পায় না। তবে বুস্টার ডোজ প্রয়োগ দ্বারা এর স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তোলা যায়। বুস্টার ডোজগুলো দীর্ঘস্থায়ী অনাক্রম্যতা বজায় রাখে।

৪। কোন পথে ভ্যাকসিন প্রয়োগ হচ্ছে তার ওপর অনেক সময় অনাক্রম্যতা স্থায়ী হয়। যেমন– খাদ্যনালি সংক্রমণের ক্ষেত্রে খাদ্যনালির মাধ্যমে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে স্থায়ী ফল প্রদান করে।

৫। অনাক্রম্যতাজনিত সাড়া জাগাতে যে সময় লাগে তা কোনো জীবাণুর ইনকিউবেশন সময়কালের চাইতে অনেক বেশি। এ কারণে দেহে রোগজীবাণু সংক্রমণের পর ভ্যাকসিন প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। তবে জলাতঙ্কের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন প্রয়োগে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কারণ জলাতঙ্কের বেলায় ইনকিউবেশনকাল অতিশয় দীর্ঘ।

টিকাকরণের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা (Importance of Vaccination)

১। টিকাকরণের ফলে দেহে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়।

২। ভ্যাকসিন দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াদের প্রজনন ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়।

৩। টিকার মাধ্যমে যেসব রোগ প্রতিরোধ করা হয় সে রকম কয়েকটি হলো– যক্ষ্মা, টিটেনাস, কলেরা, জলাতঙ্ক, হুপিংকাশি, গুটি বসন্ত, ডিপথেরিয়া, পোলিও, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস-B ইত্যাদি।

৪। টিকাকরণের ফলে কৃত্রিম শক্তির অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা হয়।

বুস্টার ডোজ (Booster dose)

দেহে অধিক মাত্রায় অ্যান্টিবডি সৃষ্টি এবং অনাক্রম্যতা সাধনের জন্য প্রাথমিক ভ্যাকসিন দেওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয় তাকে **বুস্টার ডোজ** বলে।

সংযুক্ত টিকা বা যৌথ টিকা (Combined Vaccine) : একাধিক রোগের সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে যদি একটি মাত্র টিকা প্রদান করা হয়, তবে সেই প্রকার টিকাকে সংযুক্ত বা যৌথ টিকা বলে। যেমন– DPT। এই টিকা প্রদানে ডিপথেরিয়া (Diptheria), এছাড়াও কয়েকটি সংযুক্তি টিকা হলো– হুপিংকাশি বা পারটুসিস (Pertussis) ও টিটেনাস (Tetanus) এই তিনটি রোগের হাত থেকে দেহকে রক্ষা করা যায়।

১। DT : ডিপথেরিয়া ও টিটেনাসের প্রতিষেধক,

২। MMR : মাম্পস, মিজলস ও রুবেলা রোগের প্রতিষেধক।

৩। DP : ডিপথেরিয়া ও হুপিংকাশির প্রতিষেধক টিকা।

৪। DPT ও হেপাটাইটিস-B। ৫। DPT ও HIB টিকা।

৬। DPT ও টাইফয়েড টিকা ইত্যাদি।

CamScanner

বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচি বা ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রাম (Vaccination Programme in Bangladesh)

রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে টিকার আবিষ্কার এবং এর প্রচলন মানুষের জন্য আশীর্বাদ। টিকার মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে চূড়ান্তভাবে নির্মূলের পূর্বে গুটিবসন্ত এককভাবে পৃথিবীর প্রায় ৩০-৪০ কোটি মানুষের প্রাণ হরণ করেছে। ১৯৫০ সালে আবিষ্কৃত পোলিও ভ্যাকসিন এবং এর ব্যবহার দ্বারা বাংলাদেশ বর্তমানে পোলিও রোগমুক্ত। এই টিকা বা ভ্যাকসিনের জন্যই রুবেলা, হাম, মাম্পস, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, পারটুসিস, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যগুলো হলো- (i) সুস্থ অনাক্রম্যতাকে উদ্বুদ্ধ করা; (ii) সুস্থ ও সবল বংশধর গঠনে সহায়তা করা; (iii) শিশু মৃত্যুর হার কমানো।

বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO)-এর Expanded Programme on Immunization (EPI) কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের প্রাণঘাতী ৬টি রোগ, যথা– যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, টিটেনাস, পোলিও এবং হাম-এর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এছাড়াও হেপাটাইটিস-বি এবং হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি-এর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। মা এবং শিশুকে টিটেনাস থেকে রক্ষার জন্য **টিটেনাস টক্সোয়েড** (tetanus toxoid) ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। জাতীয় ভ্যাকসিনেশনের কর্মসূচিতে (National vaccination programme) নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী টিকা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

বয়সকাল	সুপারিশকৃত টিকা
জন্মের এক মাসের মধ্যে	BCG ও OPV-O
৬ সপ্তাহ বয়সে	DPT- I ও OPV- I
১০ সপ্তাহ বয়সে	DPT- II ও OPV- II
১৪ সপ্তাহ বয়সে	DPT- III ও OPV- III
৯ মাস বয়সে	Measles vaccine
১৮ মাস বয়সে	DPT ও OPV (Booster dose)
৫-৬ বছর	DT vaccine
১০-১৬ বছর	TT vaccine

OPV = Oral Polio Vaccine
BCG = Bacille Calmette Guerin
DPT = Diphtheria, Pertussis and Tetanus
DT = Diphtheria and Tetanus
OPV-O = Zero dose
OPV-1 = 1st dose
BCG-1 = 1st dose
TT = Tetanus Toxoid

১০.৭ দেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতি কোষ বা মেমোরি কোষের ভূমিকা
(Role of Memory cell in Defence mechanism/Immunity)

কোনো জীবাণুর বিরুদ্ধে একবার প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর B-লিম্ফোসাইট এবং T-লিম্ফোসাইট উভয়েই **স্মৃতিকোষ বা মেমোরি কোষ** (memory cell) হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এসব মেমোরি কোষ (মেমোরি B-কোষ ও মেমোরি T-কোষ) শরীরকে একবার প্রতিহত করা জীবাণুকে চিনতে সাহায্য করে ফলে একই জীবাণু পুনরাক্রমণ ঘটলে অতি দ্রুততার সঙ্গে তার বিরুদ্ধে অনাক্রম্য প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারে। দেহে একই জীবাণু পুনরাক্রমণ ঘটলে মেমোরি T-কোষ অতিদ্রুত বিপুল সংখ্যক ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের T-লিম্ফোসাইট সৃষ্টি করে অনাক্রম্যতন্ত্রকে সক্রিয় করে এবং জীবাণুকে সরাসরি আক্রমণ করে ধ্বংস করে। অন্যদিকে, মেমোরি B-কোষ বিপুল সংখ্যক বিশেষ ধরনের কোষ সৃষ্টি করে যারা অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করে। এ কোষ স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে না।

B-লিম্ফোসাইটের ক্ষেত্রে মেমোরি কোষের ভূমিকা সবচেয়ে ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়। B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি তৈরির মাধ্যমে শরীরে অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এটি **হিউমোরাল ইমিউনিটির** সঙ্গে জড়িত। T-লিম্ফোসাইটের মতো বহু রকমের B-লিম্ফোসাইট দেখা যায় এবং এদের মধ্যে প্রতিটি কোষই বিশেষ বিশেষ অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে সাড়া দিতে পারে। B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং উপর্যুপরি বিভাজিত হয়ে একই রকমের অনেকগুলো লিম্ফোসাইট তৈরি করে। উপজাত কোষগুলোর বেশিরভাগই **প্লাজমা কোষে** (plasma cell) রূপান্তরিত হয় এবং অবশিষ্ট কোষগুলো **মেমোরি কোষে** (memory cell) রূপান্তরিত হয়।

CamScanner

মেমোরি কোষ অল্পমাত্রায় অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করতে পারে। প্লাজমা কোষই অ্যান্টিবডির প্রধান উৎস। প্লাজমা কোষ প্রচুর মাত্রায় অ্যান্টিবডি প্রস্তুত করে। দেখা গেছে, একটি সক্রিয় প্লাজমা কোষ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০০০ অ্যান্টিবডি

চিত্র ১০.২০ : B-লিম্ফোসাইটের বিভাজন ও স্মৃতিকোষ উৎপাদন

প্রস্তুত করতে পারে। মেমোরি কোষগুলো রক্তের মধ্যে দীর্ঘদিন, এমনকি সারাজীবন ধরে থাকতে পারে। এই কোষের উপরিভাগে IgG অথবা IgA জাতীয় অ্যান্টিবডি থাকে। কখনো অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে তা দ্রুত সাড়া জাগাতে পারে। এই সাড়া জাগানো প্রাথমিক অবস্থায় যেমন থাকে তা হতে অনেকগুণ বেশি হয়। এ কারণে কেউ যদি একবার কোনো ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে পরবর্তীকালে ওই ভাইরাসের আক্রমণের হাত থেকে সে খুব সহজেই রক্ষা পায়। এ কারণেই শিশুকালের কিছু রোগ যেমন– হাম, মাম্পস, চিকেন পক্স ইত্যাদি জীবনে একবারই হয়। **ভ্যাক্সিনেশন** (vaccination) এই নীতির ভিত্তিতেই উদ্ভব হয়েছে।

মানবদেহের স্থায়ী সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে, মাতৃগর্ভে ভ্রূণকে সুরক্ষা প্রদান এবং শিশুকে জীবাণুর সংক্রমণ হতে রক্ষার ক্ষেত্রে মেমোরি কোষের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ভ্রূণ ও শিশু মায়ের দেহ থেকে পরোক্ষভাবে মেমোরি কোষ পেয়ে থাকে।

❑ **কাজ :** (i) ভ্যাকসিন প্রয়োগের মাধ্যমে অ্যান্টিবডি তৈরি করে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। (ii) স্মৃতিকোষ অ্যান্টিবডিকে আরও ক্রিয়াশীল হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে– সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

কয়েকটি পরজীবীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা

১। **ব্যাকটেরিয়া :** শরীরে ব্যাকটেরিয়া জাতীয় পরজীবী সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে প্লাজমা কোষ নিঃসৃত অ্যান্টিবডি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া কোষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

২। **ভাইরাস :** ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে কোষনির্ভর (cell mediated) অনাক্রম্যতাই বেশি কার্যকরী। সাধারণত T-কোষ ও প্রাকৃতিক ঘাতক কোষ (NK cell) সংক্রামক ভাইরাসকে নষ্ট করে। তবে অনেক সময় অ্যান্টিবডি দ্বারা কিংবা ইন্টারফেরন সৃষ্টি করে পোষক ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

৩। **ছত্রাক :** ছত্রাকের সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রধানত কোষনির্ভর অনাক্রম্যতাই বেশি কাজে লাগে। তবে অ্যান্টিবডি IgA দ্বারা ছত্রাকের সংক্রমণ প্রতিহত হতে পারে।

৪। **প্রোটোজোয়া ও কৃমি :** মানবদেহে প্রোটোজোয়া বা কৃমির সংক্রমণ প্রতিরোধ খুব সহজ কাজ নয়। তবে সাধারণভাবে এসব পরজীবী প্রতিরোধ কোষনির্ভর অনাক্রম্যতাই বেশি কাজ করে। ঘাতক T-কোষের ক্রিয়া এ জাতীয় পরজীবীর উপর কাজ করে না বললেই চলে। তবে কিছু T-কোষ সাইটোকাইন ক্ষরণ করে ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয় করতে পারে। ম্যাক্রোফেজ ম্যালেরিয়ার জীবাণু ও কতিপয় কৃমির আক্রমণ ভালোভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। তবে অনেকক্ষেত্রে প্রোটোজোয়া ও কৃমি জাতীয় পরজীবীরা বিশেষ ক্ষমতাবলে অনাক্রম্যতা সাড়া প্রতিহত করতে সক্ষম। কোনো কোনো পরজীবী বিষাক্ত টক্সিন ক্ষরণ করে ম্যাক্রোফেজকে নষ্ট করে। এছাড়া এ ধরনের টক্সিন IgG বা অপর দ্রবণীয় অ্যান্টিবডিকেও নষ্ট করে।